চ[illegible]সম্বৃতি—১ম সংখ্যা

শ্রীচরণ-তুলসী

যা দৃষ্টা নিখিলাঘ-সঙ্ঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী
রোগাণামভিবন্দিতা নিরসনা সিক্তান্তক-ত্রাসিনী
প্রত্যাসত্তি-বিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ।

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ

মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীতুলসী-বন্দনা

যাঁহার দরশে, পাপের বিনাশ,
পরশে পবিত্র দেহ ;
সলিলে স্নানেতে, না রহে কদাপি
মরণ-ভয়ের লেহ ।
বন্দনায় হয় রোগ প্রশমিত,
রোপণে, গোবিন্দে রতি ;
গোবিন্দ চরণে· যাঁহাকে সপিলে
মিলয়ে উত্তম গতি ;—
এহেন তুলসী- রাণীর চরণে
করি শত নমস্কার,
চরণ-তুলসী গ্রন্থ লিখিয়া
জীবে দিনু উপহার ।

উৎসর্গ-পত্র

সরগুজার যুবরাণী

পরম-স্নেহাস্পদা শ্রীমতী দময়ন্তী দেবী

মহোদয়ার শ্রীকরকমলে—

মা, বামণ্ডার পুণ্যকীর্ত্তি রাজা গুণধাম,
বাসুদেব সুঢ়লদেব সুপবিত্র নাম,—
আপনার পিতৃদেব, উদার মহান্,
সুপণ্ডিত সাধুচেতা পুণ্যকীর্ত্তিমান্,
ধনে মানে কুলে শীলে গৌরবে বিদ্যায়
ছিলেন সবার মান্য বিশাল ধরায়।
আপনি তাঁহার অতি সোহাগের ধন,
করিতেন তিনি সদা স্নেহেতে যতন ;
শিশুকলে স্বামিহারা পিতার যতনে
তাঁর সুশিক্ষায় আর ধর্ম্ম আচরণে
আপনার চিত্ত আজ পবিত্র নির্ম্মল,
জ্ঞানময় ভক্তিময় মধুর উজ্জ্বল।

স্বভাবতঃ পিতৃস্নেহ আছে তব প্রতি,
কিবা দিব উপহার দীনহীন অতি ;
গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা এখানে প্রচার,—
তেমনি আমার এই স্নেহ উপহার।
তোমারই দানে মাগো তোমাকেই দান,
কৃষ্ণ-দেওয়া ফুলে কৃষ্ণ পূজার বিধান।
কিন্তু শ্রীগোবিন্দ-নাম-গুণ-লীলাময়
এই ক্ষুদ্র উপহার ; নাহি এর ক্ষয়,
যতদিন বঙ্গভাষা রহিবে ধরায়,
ভক্তকণ্ঠে বিরাজিবে কণ্ঠহার প্রায়।
শ্রীকৃষ্ণ করুন সর্ব্ব শুভ আপনার,
গ্রহণ করুন এই স্নেহ-উপহার।

বৈশাখ মাস
১৩২৯ সাল

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীরসিকমোহন শর্ম্মা
২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট।

পরিচয়

আনন্দ-বাজার ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া, পারিজ
বিকাশ, সরস্বতী, প্রেমপুষ্প ও শ্রীগৌরাঙ্গসেবক প্রভৃতি ব
মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র-সম্পাদকতার সময়ে গল্পে ও পদে
সেবারাম, সম্পাদক, শূলপাণি শর্ম্মা ও আনন্দ ভট্ট প্রভৃতি
কল্পিত নামে ও অনামে আমার লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হই
শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক মাসিক পত্রে শ্রীসচ্চিদানন্দ নামে কতিপয় প্র
প্রকাশিত হইয়াছিল। সচ্চিদানন্দ ২১ বৎসর বয়সে বি
ক্লাসের চতুর্থবার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়ে শ্রীভগবানের স
নন্দময় রাজ্যে আহূত হইয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়া
বালকটীর যথেষ্ট সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল, চরিত্র ও নির্ম্মল ছি
সে আমার সাহিত্যিক ও দার্শনিক অধ্যয়নে সততই যোগ দি
এ জীবনে সেরূপ সহায় পাওয়ার আর আশা নাই। প্রেমপ
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীকালিদাসীর নামে অনেকগুলি পদ্য প্রকা
হয়। ইহারা সচ্চিদানন্দেরই সহোদরা। এ সংসারে একটি
দুইটি কন্যা,—উপরে শ্রীভগবান্, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য তারকা ও
বৃষ্টি বাতাস,—এবং পৃথিবীতে শ্যামল তরু লতাবল্লরী ও নদ
প্রভৃতি আমার মানসিক চিন্তা শক্তিকে জাগাইয়া দিয়া সময়ে স
প্রাণের কথা ভাষায় প্রকাশ করিয়া দিতেন, আমি সর্ব্বভূ
দেবতার অস্তিত্ব বিশ্বাস করিয়া মনের খেয়ালে কিছু কিছু লি

প্রকাশ করিতাম। সেই সকল প্রবন্ধেরই কতকগুলি এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল। আমার সম্পাদিত সাময়িক পত্রের পাঠকগণ বহুবার অনেকগুলি প্রবন্ধের পুস্তকাকারে মুদ্রণের জন্য অনুরোধ করেন। তখন আমি তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। আমি জানি আমার ইচ্ছায় কিছুই হয় না। শ্রীগোবিন্দের কৃপাভিন্ন আমি আত্মশক্তিতে কখনও কোন কার্য্য করিতে পারি না। সত্যকথা এই যে—

আপন ইচ্ছায় জীব কোটি বাঞ্ছা করে।
কৃষ্ণের যেরূপ বাঞ্ছা, সেই ফল ধরে॥

কোন সময়ে এক্ষুদ্র হৃদয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সহজে এবং সহসা একটি শ্লোক প্রত্যাদেশের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা এই :—

স্বেচ্ছয়া কুরুতে জীবো বাঞ্ছা-কোটি শতানি চ।
কৃষ্ণেচ্ছা-বিরহেণৈব একাপি তু ন সিদ্ধতি॥

আমি সুদীর্ঘ জীবনে এ সত্য ভুলিতে পারি নাই পরন্তু এই মহাসত্যে এখন ক্রমশঃই বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতেছে। সুতরাং মনে প্রাণে এখন ইহাই বলিতে প্রবৃত্তি হয়—"হে ভগবন্, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক"। অলমতিবিস্তরেণ

শ্রীরসিকমোহন শর্ম্মা
২৫ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট্।

সমর্পণ

শ্যামল সুন্দর বন মৃদুস্নিগ্ধ সমীরণ,
তার মাঝে নিকুঞ্জ কুটীর ;
কোমল লতিকা পাশে মৃদুল মধুর হাসে
নতশির তুলসী-মঞ্জির ;
কোমল মাধুরীময় তুলসীর পত্রচয়
সাঁঝের আলোক মাখি গায়,
কত কি বলিল মোরে সব নাহি মনে পড়ে
সুকোমল নীরব ভাষায়।
যাহা কিছু ছিল মনে এই ক্ষুদ্র নিবেদনে
তার কিছু করিনু প্রকাশ ;
উদাস বাউল মন জানে না তো বিরচন
গেঁথে দিনু তবু লেশাভাস।
গোবিন্দ-চরণ-শোভা ভকতের মন-লোভা
চরণ-তুলসী চির দিন,
সুচারু শ্যামলদ্যুতি স্নিগধ কোমল ভাতি
ভক্ত-করে সপিল এ দীন।

অভিসার

ছিলেম ঘুমিয়ে জাগিয়া দেখিনু
যামিনী হয়েছে ভোর,
তটিনীর বুকে বরষা উদয়,
স্রোতের নাহিক ওর।
মরুভূমি যত গিয়াছে ভাসিয়া,
বুকভরা জল তায়,
তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিয়া চলিছে
পাছে না ফিরিয়ে চায়।
শ্যাম-জলধির মিলন-আশায়
সব বাধা পরিহরি,
দুকুল ভাসা'য়ে ধাইছে তটিনী
উন্মাদিনী-বেশ ধরি।
পরাণ মিশিল তটিনীর সাথে
না চাহে রহিতে ঘরে,
কি জানি কে ডাকে, কাহার সন্ধানে
যেতে চায় ছুটে দূরে।

শ্রীচরণ-তুলসী

প্রণতি

(১)

কনককান্তি শ্রীমুখকমল
উজ্জ্বল ভাতিময়,
কারুণ্য-কিরণ-নয়ন কমল-
উচ্ছল প্রেমোদয়,
প্রেম মূরতি ভাববিভাবিত-
দীপ্ত-মধুর-রস,
প্রণমি চরণে দেব-দেব
ভক্তি-রসের বশ।

(২)

স্বার্থচিন্তা-বৈভব-গর্ব্ব-
বর্ব্বরভাব-গ্রাসে
গ্রস্ত দেশ লভিল ত্রাণ
প্রেমপীযূষরসে ;

বন্ধমোচন, মোহতিমির-
খণ্ডন-অবতার,
প্রণমি চরণে দেব-দেব
নিখিল বিশ্বাধার।

(৩)

প্রশান্ত চিত্ত পবিত্র মহান্
কীর্ত্তন-মাতোয়ার
ভাবজলধি-তরঙ্গ-রঙ্গ-
উচ্ছ্বাস-পরচার,
চন্দ্রবদন সুদীর্ঘবাহু
উন্নতনাস ধীর,
প্রণমি চরণে দেব-দেব
নাম-তাণ্ডব-বীর।

(৪)

প্রেম-লহরী-প্রবাহপূর্ণ-
দীপ্ত-আনন্দ-ধাম
শান্ত মধুর স্নিগ্ধ দৃষ্টি-
তৃপ্তপূর্ণ কাম;
সান্দ্রপুলক-পরীতঅঙ্গ
নীপকিঞ্জল্কনিন্দ্য
প্রণমি চরণে দেব-দেব
ব্রহ্ম-মহেশবন্দ্য।

(৭)

ইন্দু-নিন্দিত-নখরচন্দ্র

মন্থর মৃদু গতি,

ঊর্দ্ধভুজ স্তিমিতনেত্র,

নাম-কীর্ত্তনে রতি ;

বিম্বনিন্দিত কম্পিতাধর

গদ্গদ মৃদু ভাষ,

প্রণমি চরণে দেব-দেব

অমৃতপরকাশ।

(৬)

অধমবন্ধু করুণাসিন্ধু

সদয় মধুর মূর্ত্তি,

নিখিল-বিদ্যাবিভব-চিত্ত

বিশ্ববিখ্যাত কীর্ত্তি,

নেত্রকমল-অশ্রুপ্রবাহে

স্নপিত সর্ব্বদেশ,

প্রণমি চরণে দেব-দেব

উজ্জ্বল যতিবেশ।

(৭)

কৃষ্ণকীর্ত্তন-গাননর্ত্তন-

ভাববিভোরদেহ,

ধূলি-লুণ্ঠিত রোম-অঞ্চিত

পূর্ণ লাবণ্য-গেহ ;

বিশ্বমঙ্গল বিশ্বপ্রেম-
ধৃতপরমসত্ত্ব,
প্রণমি চরণে দেব-দেব
নিজ ভকতিমত্ত।

(৮)

উজ্জ্বলরস-কদম্ব-দীপ্ত-
বিগ্রহ-রস-সার
নিখিল প্রেমপীযূষপূর্ণ
মঙ্গল-অবতার
নদীয়ানন্দ দীনের বন্ধু
কল্মষনাশে ভোর
প্রণমি চরণে দেব-দেব
মঙ্গলময় গৌর।

হরি, তুমি আছ।

একটী একটী করিয়া যখন আশার আলোকগুলি নিভিয়া যায়, নিরাশার গভীর আঁধারে বিষণ্ণ হৃদয় যখন ডুবিয়া পড়ে, সংসারের ধনবল,—জনবল,—বিদ্যাবল,—বা বাহুবল কিছুতেই যখন বিষাদ-নিমগ্ন হৃদয়কে উপরে তুলিতে পারে না, তখন বিবশ ভাবে আপন নির্জ্জন কুটীরে হরি তোমার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়

লই, তোমাকে ডাকি, তোমার চরণ দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল হই, অনন্ত প্রান্তরের উপর দিয়া দূরে দূরে চাহিয়া দেখি, অনন্ত আকাশের নৈশ-নীলিমায় চন্দ্র তারকার জ্যোৎস্নার দিকে তাকাইয়া থাকি, হরি তোমাকে দেখিতে পাই না। কিন্তু মনে হয়—"হরি তুমি আছ।"

আকাশে চাঁদ উঠে,—বাগানে ফুল ফোটে,—শিশুরা আনন্দে কোলাহল করে—পাখীরা কলকণ্ঠে বুঝি, তোমারই নাম গান করে, তটিনী কলকল-কুল-কুল তানে ছুটিয়া প্রবাহিত হয়, অনন্ত শ্যামজলধির বক্ষে নিজের হৃদয় ঢালিয়া দিবার জন্য অনন্তের দিকে অনন্ত বেগে ধাবিত হয়। তখন মনে হয়,—প্রাণের প্রাণ শ্যামসুন্দর,—আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়তটিনী ও তোমার ঐ শ্যাম-প্রেম-সাগরে ঝাঁপ দিয়া কবে পরম তৃপ্তিলাভ করিবে?

পাখীর কল-কূজনে এ পোড়া প্রাণ এম্‌নি ব্যাকুল হয়, তটিনীর কলতানে তটস্থ তরু-লতা-বল্লরীর শ্যামল শোভায় হৃদয়ে এমনি একটা ব্যাকুলতার সঞ্চার হয়,—হে চিরসুন্দর, আমি কবে তোমার দেখা পাইব, কবে সকল ভুলিয়া তোমার শীতল চরণতলে শরণ লইব? আশাবদ্ধ হৃদয়ে, হরি, কতবার তোমায় ডাকি, তোমায় দেখিতে পাই না, কিন্তু প্রতি ডাকে তুমি সাড়া দাও, তাই বুঝিতে পারি,—হরি তুমি আছ।

বিপদে পড়িয়া তোমাকে ডাকি, সুপদের সুখ-শয্যায় তোমার কথাই স্মরণ হয়; দুঃখে পড়িয়া অভিমান করিয়া বলি—নিঠুর, আর কতদিন অবিশ্বাসের পাষাণচাপে এ ক্ষুদ্র হৃদয় নিষ্পিষ্ট

করিবে? কত অন্যায় কথা বলি, কত অসঙ্গত কথা মনে তুলি, —কিন্তু দীনবন্ধু পতিতপাবন! তুমি সকল দোষ ক্ষমা কর,— আত্ম পরিচয় প্রদান কর। যখন তোমার মহাশক্তির মহা মহিমা এ অবিশ্বাসীর হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রচারিত হয়, তখন বুঝিতে পারি "হরি, তুমি আছ।"

তোমার ইঙ্গিত অস্পষ্ট হইলেও আমি তাহা বুঝিতে পারি, তুমি আমায় ভালবাস—বড় গোপনে ভালবাস, দেখা দাও না, —আড়ালে থাকিয়া ভালবাস; রসময়, তোমার এ ভালবাসা আমি বুঝিতে পারি। কিন্তু উহার প্রতিদানে আমি কিছুই দিতে পারি না, বড় লজ্জিত হই,, কি করিব,—আমি ক্ষুদ্র, তুমি মহান্—কিন্তু এই তুলনা করিতে গিয়াও—হৃদয়ে ক্লেশ হয়, মনে হয়, যেন কত দূরে রহিয়াছি—মনে হয় এ ক্ষুদ্রকীট কি করিয়া তোমার ভালবাসার যোগ্য হইতে পারে,—কি করিয়াই বা তোমায় ভাল বাসিতে পারে—মনে করি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এ কথা মনে তুলিব না, প্রাণ যদি তোমায় চায়, তবে তোমার কাছেই ছুটিয়া যাইব। আমি যোগ্য কি অযোগ্য, সে বিচারের আর তখন অবকাশ থাকে না, এইরূপ ভাবিয়া নিরাশ প্রাণে হরি তোমায় ডাকি,—কত দিন-যামিনী এ পোড়া হৃদয়ে নিরাশার আগুণ জালিয়া জালিয়া হৃদয় দগ্ধ করে; সহসা কোথা হইতে কাণে, তোমার মধুর ধ্বনি প্রবেশ করে, তুমি ডাকিয়া বল "এই অনন্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় জগতের যখন যেদিকে চাহিবে, তখনই আমাকে দেখিতে পাইবে।"

দয়াময়! তোমার এ আশার ভাষা সময়ে সময়ে শুনিতে পাই; কিন্তু তাহাতে হৃদয় তৃপ্ত হয় না। আশার পরিবর্ত্তে নিরাশার কালমেঘে এ ক্ষুদ্র হৃদয় ঢাকিয়া ফেলে, তখন ভয়ে ভয়ে, তোমায় ডাকি; তখনও তোমার আশ্বাসধ্বনি হৃদয়ে শুনিতে পাই,—তখনও-মনে হয়,— হরি তুমি আছ।"

কিন্তু তোমার ইঙ্গিতে,—তোমার আশার ভাষায় আমি এই ক্ষুদ্র জীবন আর কতদিন ধারণ করিব? মনে হইতেছে যেন তোমাকে ছাড়িয়া কত দূরদেশে পড়িয়া রহিয়াছি; কিন্তু শুনিতে পাই, তুমি আমার অতি নিকট—আমার প্রাণের অপেক্ষাও নিকট। মনে হয়, ইহা সত্য কথা, তবে এত লুকোচুরি কেন? আর কত কাল এমন করিয়া আমায় প্রতারণা করিবে! দেহ ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, হৃদয়ে তেমন বল নাই যে, তোমাকে ভাল বাসিয়া টানিয়া আনিব,—ভাষায় এমন জোর নাই যে, তোমায় ডাকিয়া ডাকিয়া ব্যাকুল করিয়া তুলিব, আত্মার এমন ক্ষমতা নাই যে ছুটিয়া গিয়া স্রোতস্বিনী তটিনীর ন্যায় তোমার শ্রীচরণতলে লুটাইয়া পড়িব! এভাবে এ ক্ষুদ্রের সহিত, হে রসময়, আর কতকাল লুকোচুরি করিবে? একটীবার দয়া করিয়া নয়ন-সম্মুখে উপস্থিত হও, জীবন থাকিতে একবার তোমাক দেখিয়া লই। আমি বুঝিয়াছি, হরি "তুমি আছ"। তুমি চন্দ্রে আছে, সূর্য্যে আছ, নীলাকাশের অগণ্য তারায় তারায় তোমারই হাসি ফুটিয়া রহিয়াছে, ফুলে ফলে, লতায়, জলে স্থলে সর্ব্বত্রই তুমি আছ।

তুমি চিরসুন্দর, তুমি আমার চিরসুহৃদ, আমার প্রাণ তোমাকে চায়, সাধন জানি না। বৃন্দাবনের বনে বনে যে প্রেমের মোহন তানে ব্রজগোপিকাবৃন্দ সনে তুমি লুকোচুরী খেলা কর, সেখানে তোমার এ খেলা সাজে,—চতুরে চতুরে, প্রেমিকে প্রেমিকে, সে রস, সে মাধুর্য্য প্রকৃত পক্ষেই মধুময় হইয়া উঠে। কিন্তু এ ক্ষুদ্র জীব, সে প্রেম সিন্ধুর বিন্দুমাত্রও লাভ করিতে অযোগ্য, তাই প্রার্থনা, তোমার চিরস্বভাব লুকোচুরী ভাব ছাড়িয়া দিয়া সরল ভাবে দেখা দাও,—তাপিত প্রাণ শীতল কর। জীবন থাকিতে একবার তোমায় দেখি ; তার পর—এ জীবনের যে গতি হয় হউক ; তোমার মূর্ত্তি হৃদয়ে লইয়া যেন চিরতরে নয়ন মুদিতে পারি, এই কৃপা রেখো। কতবার তোমায় অবিশ্বাস করিয়াছি, কতবার বৃথা কুতর্ক মনে আসিয়া হৃদয়কে অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছে, রোগের যাতনায়, শোকের তাড়নায়, লোকের গঞ্জনায় কতবার এ দীন চিত্ত অবিশ্বাসের অন্ধতমসে ডুবিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু দয়াময়, তখনও তুমি মেঘাচ্ছন্ন গগনে বিজলি-চমকের ন্যায় সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল-ভাবে চমক দিয়া নিজকে প্রকাশ করিয়াছ, তখনই অবিশ্বাসের মধ্যে বিশ্বাস আসিয়াছে, নিশার তমিস্র নরকে গোলোকের আশার আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে, আর তখনই আমার মলিন আত্মা তোমার আলোক পাইয়া বুঝিয়াছে —হরি, তুমি আছ।

জগতের প্রতিপরমাণুতে তোমার লীলা, প্রতি জীবে তোমার খেলা, প্রতি তারায় তোমারই চাহনি—কি মধুর! কি সুন্দর!

তুমি সর্ব্বত্রই নিজকে প্রকাশ করিয়াছ, অথচ "তোমায় দেখিতে পাই না," একথা কি করিয়া বলিব? যাহারা বলে তুমি অরূপ, অরস, অশব্দ, অস্পর্শ ও অগন্ধ তাহাদের ভাব ও ভাষা বুঝিতে পারি না। তোমার রূপে জগৎভরা, তোমার রসে জগৎ মধুর, তোমারই মোহন স্বরে জগৎ মুখরিত, তোমারই স্পর্শে জগৎ আনন্দময়, তোমারই গন্ধে জগৎ আমোদিত—তুমি রূপে আছ, রসে আছ, শব্দে আছ, স্পর্শে আছ, গন্ধে আছ—সর্ব্বত্রই তুমি আছে, কেবল তুমিই আছ।

ধীরে ধীরে বুঝিয়াছি, কেবল তুমি আমার।" তুমি আমার চক্ষের জ্যোতি, তুমি আমার বক্ষের স্পন্দন, তুমি আমার নাসার গন্ধ, তুমি আমার কাণের শব্দ, তুমিই আমার অন্তরের চিন্তা—তুমি আমার আত্মার আত্মা। আমার কেবল তুমি আছ—কেবল তুমিই আছ।

শ্রীপঞ্চমী

নমি বীণাপাণি, বাণি, ভারতি,
আজিকে তোমায়।
আজি কবিতাময় জগত চরাচর
সুন্দর মধুর বিমল শোভায়।
প্রেম-কুসুম আজি অভিনব ছন্দে,
বিকশিত বিরাজিত মঙ্গল গন্ধে;

তোমারি সেবায় আজি পুণ্য প্রবন্ধে
দেশে দেশে প্রচারিত তোমারি প্রভায় !
উঅল নব রবি ভাতি সমুজ্জ্বল
চন্দ্র-তারকা-রাজি শুভ্র সুঝলমল
বিমল সরসি জল সমীরণে উচ্ছল
আকুল মলয় আজ, বনে বনে গায় :—
তোমার মোহন গীতি ছন্দ—
কুসুমিত কানন-আনন্দ-কন্দ
প্রেম-রস-প্লুত তরুলতাবৃন্দ
লব্ধজীবন নব তোমারি কৃপায়।
শুষ্ক হৃদয় মরু রসহীন শুষ্ক প্রাণ
জাগাও করুণাময়ি এতে প্রেম-রস-গান,
যে গানে অশ্রুর জলে
নিয়ত পাষাণ গলে ;
যে গানে নাস্তিক পড়ে শ্রীহরি-চরণ-তলে ;
যে গানে ভজিবে মন
মধুময় বৃন্দাবন,
মজিবে প্রেমের রসে অনন্ত পাষণ্ডগণ,
দাও, গো করুণাময়ি, সে শকতি এ হিয়ায় ॥

শ্রীকালিদাসী দেবী
২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট।

শ্রীসরস্বতী-প্রণতি

১

হৃদয়-কমলে বসো মা ভারতি
শ্বেত কমলবাসিনি,
শুভ্র কুসুমে শোভিত অঙ্গ
শুভ্র বিপঞ্চিধারিণি !
বিরাজ হৃদয়ে জ্ঞান-রূপিণি
জ্ঞানদে শ্বেতবসনে
প্রণমি মাতঃ বিষ্ণু-শকতি
তোমার কমল-চরণে।

২

আঁধারে যখন বিশ্ব প্রাণ
ছিল জড় সম অজ্ঞ,
না ছিল শাস্ত্র বেদ বেদান্ত
ভক্তি, জ্ঞান-যোগ-যজ্ঞ ;
তুমি মা তখন সুবিদ্যা-দাত্রি
স্ফুরিলে মানব মননে,
প্রণমি মাতঃ বিষ্ণু-শকতি
তোমার কমল-চরণে।

৩

ব্রহ্মার হৃদয়ে হরি-প্রেরণাতে
তুমি প্রকাশিলে তত্ত্ব,
জ্বালিলে জগতে জ্ঞানের প্রদীপ,
জীব জানিল সত্য।
মঙ্গলময়ি মানস-চারিণি
ফুল্ল-পঙ্কজ-নয়নে,
প্রণমি মাতঃ বিষ্ণু-শকতি
তোমার কমল-চরণে।

৪

গাইল উষার কনক কিরণে
তোমার মধুর মন্ত্র
বৈদিক ঋষি, নেহারি জগৎ
রচিল সাধন-তন্ত্র।
কপিল কণাদ বাল্মীকি ব্যাস
পূজিল ভকতি যতনে ;
প্রণমি মাতঃ বিষ্ণু-শকতি
তোমারি কমল চরণে।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী
২৫ নং বাগ্‌বাজার ষ্ট্রীট।

আমার ফুলের বাগান।

এই মাঘের শেষে আমার ফুল-বাগানে আবার নূতন জীবন দেখা দিয়াছে,—সে জীবন সতেজ সরস সুন্দর ও সুপ্রসন্ন। এমন শান্ত সুন্দর সুষমা আমি আর কোথাও দেখিতে পাই না। জগৎ পরিবর্ত্তনময়; অনন্ত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সংসারের ভাল মন্দ পাপপুণ্য সুখদুঃখ আশানৈরাশ্য ভাসিয়া চলিয়াছে—রাজার প্রাসাদ হইতে কাঙ্গালের কুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই পরিবর্ত্তনের প্রবাহ অনিবার্য্যরূপে উধাও ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু আমার ফুলবাগান নিত্যই নূতন। এখানে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শিশির বসন্ত প্রতি ঋতুতেই নূতন জীবন—প্রকৃতির নব নব ভাব-সন্দর্শনে আমি আনন্দে বিভোর হই। গ্রীষ্মের নিদাঘে যখন জগতের জীব তপন-তাপে প্রতপ্ত হয়; গভীর জলাশয়সমূহ বিশুষ্ক হইয়া যায়, আমার অতি সাধের ফুলবাগানে তখনও "রসো বৈ সঃ" পূর্ণ স্ফূর্ত্তিতে আমায় চিত্ত-সমক্ষে স্বীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য বিস্তার করেন। তখনও আমি কোন-না-কোন লতার সবুজ পাতায় সরস জীবনোদ্গম দেখিয়া সেই অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়, অবশেষে সেই আনন্দময় পরব্রহ্ম শ্যামসুন্দরের লীলামাধুরী প্রত্যক্ষ করি।

আমার ফুল বাগান—অমৃতের রাজ্য। এখানে নৈরাশ্য নাই, বিপদ নাই, ভয় নাই, মরণ নাই। আমার ফুলবাগানের

লতায় লতায় ফুল ফুটে ; সে কুসুমোদ্গমের বিরাম নাই. কালা-কালের বিচর নাই। প্রাকৃতিক দৃষ্টিতে যাহার অভাব অনুভূত হয়, আমার প্রত্যক্ষের নিকট সে অভাবের অবসর নাই। আমার ফুলের বাগান সর্ব্বদাই পূর্ণ। এমনই একটা বিরাট্ বিপুল বিশাল পূর্ণতা আমার ফুলের বাগান জুড়িয়া বসিয়াছে। এখানে পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

অপূর্ণতার উপলব্ধি এখানে নাই,—নৈয়ায়িকগণের তথাকথিত ত্রিবিধ অভাবই এখানে অত্যন্ত অভাবে পরিণত হইয়াছে। এখানে অসংখ্য ফুল ফুটিতেছে—মনোমদ গন্ধে দশদিক আমোদিত—সুকণ্ঠ বিহগকণ্ঠে কাননাকাশ মুখরিত। প্রীতির এমন রম্য নিকেতন—সংসারী দেহীর অনধিগম্য।

নিরানন্দ,—তোমাদের অজ্ঞান-অবিদ্যা-বিলসিত শব্দমাত্র। আমার ফুল বাগানে আনন্দের নিত্যলীলা। এখানে আসিলে বুঝিতে পাইবে—

'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি।'

এই আনন্দ-উদ্যানে কেবলই আনন্দ। তোমাদের ফুল বাগানে গ্রীষ্ম আছে, বর্ষা আছে, শরৎ আছে, হেমন্ত আছে, শীত আছে—কিন্তু এখানে চির বসন্ত।

তোমরা যাহাকে জড় বল বা জড়ীয় বল, এখানে তাহার কোনও সম্বন্ধ সংস্রব নাই—এখানে সকলি চিদানন্দময়। জন্ম-

জরা-বিয়োগ-মরণের উৎপাত-উপদ্রব এখানে দেখিতে পাইবে না। এ স্থান নিত্য জ্যোতির্ম্ময়, নিত্য সমুজ্জল ; অথচ তোমাদের চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র বিদ্যুৎ অগ্নি প্রভৃতি আমার ফুল বাগানের ত্রিসীমাতেও ঘেসিতে পারে না।

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনু ভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

এমন চিরমধুময় চিরসমুজ্জল ফুল-বাগানের অনন্ত শোভা দেখিতে কি তোমাদের সাধ নাই? রসময় নিকুঞ্জবিহারী এই ফুলবাগানের কেন্দ্রশোভা! তাঁহার জ্যোতি সর্ব্বত্র বিসারিত, তাঁহারই সৌন্দয্য-মাধুরী সর্ব্বত্র বিচ্ছুরিত, তাঁহারই অনন্ত মহিমা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত।

মনে হয় তোমাদিগকে ডাকিয়া ডাকিয়া এখানে লইয়া আসি, মনে হয় তোমাদের সাথে সাথে আমার চিরসাধের রম্য-কাননে বিচরণ করি, কিন্তু তোমরা ত আমায় চাও না—আমা হইতে দূরে দূরে থাকিয়াই তোমাদের সুখ—কিন্তু সে সুখ কি সুখ? তোমরা জানিয়াও জান না, দেখিয়াও দেখ না, বুঝিয়াও বুঝ না। তোমরা ভাব এক—মুহূর্ত্তেই ঘটে আর! তোমাদের হাসির রেখা দেখিতে দেখিতে বিষাদের আঁধারে ডুবিয়া যায়, তোমাদের উল্লাসের জয়-ধ্বনি হৃদবিদারক শোকের আর্ত্তনাদে দেখিতে দেখিতে মিশিয়া যায়। এই তো তোমাদের সুখ!

আঃ ছিঃ! আর কেন? এস, আমার ফুলবাগানে এস। এখানে জন্মমৃত্যু নাই, হর্ষবিষাদ নাই, ভাবাভাব নাই—আছে

কেবল পূর্ণানন্দ—আর সেই অনন্ত অখণ্ড অপরিবর্ত্তনীয় উজ্জ্বল আনন্দের কেন্দ্রে বিরাজিত আমাদের—সেই আনন্দময়—সেই আনন্দলীলারসবিগ্রহ,—সেই দিব্য-হেমাভ-সুন্দর-চ্ছবি—সেই মহা-প্রেম-রস-প্রদ কুসুম-সুষমার রাজরাজেশ্বর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।

দীন দুঃখী এস, শোকী তাপী এস, অন্ধ পঙ্গু এস, ব্রাহ্মণ হও, চণ্ডাল হও—এস, মূর্খ হও, পণ্ডিত হও—এস। এখানে সকলেরই প্রবেশাধিকার সমান—সকলেই এস। আমার এ সাদর আহ্বান, সপ্রেম আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিও না, আমার এ আমন্ত্রণ কৃপা করিয়া গ্রহণ কর; দেখিবে এখানে অনুমান উপমান বা শব্দ প্রমাণের অপেক্ষা নাই—আনন্দ এখানে মূর্ত্তিমান্—আনন্দময় এখানে প্রত্যক্ষের বিষয়—যাহা জ্ঞান, যাহা আনন্দ—তাহাই এখানে আনন্দময়—আনন্দপ্রচুর বলিয়া তাহাতে যে দুঃখের লেশাভাস আছে এমন মনে করিও না।

যদুক্তমানন্দপ্রাচুর্য্যমল্পদুঃখসদ্ভাবমবগময়তীতি তদসৎ তৎপ্রচুরত্বং হি তৎপ্রভুত্বম্; তচ্চেতরস্য সত্তাং নাবগময়তি, অপিতু তস্যাল্পত্বং নিবর্ত্তয়তি।

অর্থাৎ আনন্দ শব্দের উত্তর প্রাচুর্য্যার্থ ময়ট্ প্রত্যয় যোগে এই আনন্দময় শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। মনে করিতে পার যে প্রাচুর্য্য বলায় অল্পমাত্র দুঃখেরও লেশাভাস থাকিতে পারে। বস্তুতঃ তাহা নহে, আনন্দ প্রচুরত্ব পদের অর্থ—আনন্দ প্রভুতত্ব, আনন্দ ভিন্ন দুঃখের সত্তা আনন্দময়ে বিন্দুমাত্রও নাই।

আমরে ফুলবাগানে এই আনন্দময়, নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয়। তাহা হইতেই তোমাদের এই জাগতিক আনন্দ :—

প্রেমে-প্রাণে,গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোকে ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ ;
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া ।

আমার ফুলবাগানের সৌন্দর্য্যেই তোমাদের জগতের সৌন্দর্য্য ; আমার ফুলবাগানের কোমলতায় জগতের কোমলতা ; এখানকার সৌন্দর্য্যেই তোমাদের সৌন্দর্য্য ; এখানকার সুরসেই তোমাদের নিখিল রসের সৃষ্টি ; আর এখানকার সুবাসেই তোমাদের জগতের সুবাস ।

এখন নকল ছাড়িয়া আসলের দিকে অগ্রসর হও, কল্পনা ছাড়িয়া প্রকৃতরাজ্যে এস, অনিত্য ছাড়িয়া নিত্যে এস, সঙ্কীর্ণ ছাড়িয়া, অল্প ছাড়িয়া অসীমে এস, অনন্তে এস ।

তুমি তো আছ !

এসে এসে সব যায় চলি
হৃদয়ে রাখিয়ে দাগ ; পরে যাই ভুলি !
কিছুদিন হাহাকার বিশ্বময় অন্ধকার
পুরাণো স্মৃতির কথা হৃদয়েতে তুলি ;

কত ফেলি অশ্রুজল বিষাদের হলাহল
শোকের হৃদয়-শোষি বিষময় বুলি—
কিছুদিন পরে পুন সব যাই ভূলি।

২

দেখিতে দেখিতে আলো আঁধারেতে মিশে,
দেখিতে দেখিতে আশা নিরাশায় ভাসে।
এক আসে, আর যায় যে যায় ফিরে না চায়;
কে যে যায়, কোথা যায়, কোথা হ'তে আসে,
ভাবে চিত দিবানিশি নিরজনে ব'সে।

৩

এক সত্য চিরদিন,—তুমি আছ হরি;
বিশ্বের তরঙ্গ ভঙ্গ উঠা-পড়া লীলারঙ্গ
সুখ দুঃখ হর্ষ শোক,—ভাব ব্যভিচারী;
তুমি সুধু স্থায়ীভাব—অনন্ত বিসারী।
যত থাকে যত যায়, ভাবিব না আর,*
তুমি আছ—তুমি সব—তুমি তো আমার।

শ্রীকালিদাসী দেবী
২৫ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট।

---

* কনিষ্ঠসহোদরার মৃত্যুর পরে লিখিত।

বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ

ভুবনানন্দ শ্রীগোবিন্দ! তোমার জয় হউক। আমি বৃহদারণ্যক উপনিষৎ হাতে লইয়া তোমার বৃন্দাবিপিনে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তুমি দয়াল-শিরোমণি, বাঞ্ছাকল্পতরু! তুমি আমায় নিরাশ কর নাই,—আমি শুষ্ক স্থাণুতে মন রাখিয়া শুষ্ক ধ্যানের প্রয়াসী হইয়া ছিলাম, এখন তোমার বিচিত্র ইন্দ্রজালে আমার সে শুষ্ক স্থাণু শাখা-প্রশাখায় ও বিচিত্র হরিৎ পত্রে সমাবৃত ও সুশোভিত হইয়াছে—মঞ্জরিত হইয়াছে—এখন এখানে কোকিলকূজিতকুঞ্জ-কুটীর—বঞ্জুল-মঞ্জুল মঞ্জরীতে মঞ্জরীতে মনমোহন গুঞ্জরণ—সবুজ পত্রাবলীর সজীবতা—সকলি সরস ও সুন্দর। গোকুলানন্দচন্দ্র, গোকুলবিহারী শ্রীগোবিন্দ, বুঝিলাম তোমারই জয়! বৃহদারণ্যক উপনিষদে পড়িতেছিলাম—

> যদ্‌বৃক্ষো বৃক্ণো রোহিত মূলান্নবতরঃ পুনঃ
> মর্ত্ত্যঃ স্বিন্মৃত্যুনা বৃক্ণঃ কস্মান্মূলাৎ প্ররোহতি।
> জাত এব ন জায়তে কোন্বেনং জনয়েত পুনঃ
> বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্।
>
> বৃহঃ আরণ্যক উপঃ ৩ অঃ ৯ম ব্রাহ্মণ

ঝড় হয়, গাছ ভাঙ্গে স্থাণু পড়িয়া থাকে, ডাল পালা নাই, পাতা প্রবাল নাই, ফুল নাই,—কেবল এক শুষ্ক স্থাণু। কিন্তু দেখিতে দেখিতে, আবার উহা নবতর হইয়া উঠে, নবরসে নব নব প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া আবার সুচিকণ সরস সজীব হইয়া

দাঁড়ায়। মরণের পরে কে আবার তরুকে এই নবপ্রাণে জাগাইয়া তুলে—কোন্ মূল হইতে আবার উহার প্ররোহ হয়? এ মৃতকে কে আবার সঞ্জীবিত করে?

"মর্ত্ত্যঃ স্বিদ্ মৃত্যুনা বৃক্ণঃ কস্মান্ মূলাৎ প্ররোহতি?" মৃত্যু দ্বারা যখন গাছ ভেঙ্গে যায়, সেই ভাঙ্গা গাছ—সেই স্থাণু আবার কোন মূল হইতে নব জীবনে জাগিয়া উঠে?

বৃহদারণ্যকের এই প্রশ্নের সদুত্তর কেবল তোমার নিকটেই পাওয়া যায়। এই প্রশ্নে মানুষের হৃদয়কে যে আনন্দময় রাজ্যে,—রসময় রাজ্যে,—সমুদয় রাজ্যে লইয়া যায় সেখানে তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পাই না।

হে নিখিলরসামৃতমূর্ত্তি—হে বৃন্দাবন-বনবিহারি,—তুমি ভিন্ন মৃতদেহ নবপ্রাণে সঞ্জীবিত, নবশোভায় পরিশোভিত—নবরসে উচ্ছলিত করিয়া তুলিতে আর কেই বা সমর্থ? তোমার ভুবন-বিজয়ি নামের মৃতসঞ্জীবনমন্ত্রে সিদ্ধ হইয়াই তো সিদ্ধেশ্বর শ্মশান-বিহারী সদাশিব মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন।

হে সর্ব্বজীবন-মূলাধার, তুমি সর্ব্বত্রই জীবনের আনন্দধারা প্রবাহিত করিতেছে তাই তুমি—

"প্রাণস্য প্রাণমুচ চক্ষুষ শ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ মনসো মনঃ।"

হে ব্রজজীবন—তুমি নিখিলবিশ্বের প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র ও মনের মন। হে আমার চিরসুন্দর, চিরমধুর! তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, কর্ণের কর্ণ, নয়নের নয়ন, মনের মন ও আমার আত্মার আত্মা। আমি মরিতে বসিয়াও মরিতে পারি না; তুমি আবার নবজীবন-দানে আমায় বাঁচাইয়া তোল।

হে জীবনানন্দ শ্রীগোবিন্দ, হে ব্রজবিপিনবিহারি—হে বিশ্বজীবন—শ্রীবৃন্দাবিপিনে তোমার অনন্তলীলা প্রকাশ পায়, ভক্তগণ অস্বাদন করেন—প্রেমিকগণ তাহা উপভোগ করেন। সে সকলে—ক্ষুদ্র আমি, আমার দর্শন অধিকার নাই। তোমার প্রিয়তম উদ্ভিদরাজ্যে তোমারই অপূর্ব্ব লীলায় মৃতস্থাণু কিরূপে নবজীবন পায়, শুষ্কতরু কিরূপে মঞ্জরিত হয়—নব শোভায় শোভিত হয়—নবরসে পরিষিক্ত হয়,—হে জীবনবন্ধো আমার ক্ষুদ্র প্রাণ তোমার সেই লীলাসুধাসিন্ধুর বিন্দুমাত্রেই ডুবিয়া যায়—হে শ্রীবৃন্দারণ্যানন্দকন্দ শ্রীগোবিন্দ, বৃহদারণ্যকের মন্ত্রাবলী তোমাকে পাইয়াই কৃতার্থ ও সার্থক হইয়াছেন। হে ভুবন বিজয়—আমি দেখিতেছি—সর্ব্বত্র কেবল তোমারই জয়।

জ্যোতির্ম্ময়ী*

কে আসিছ জ্যোতির্ম্ময়ী বেশে,
আমাদের শান্তিময় বাসে?
সাজায়েছি আশার আসন
স্থাপিতে তোমার শ্রীচরণ;
এস দেবী স্বর্গের সুষমা
পঞ্চানন-দেব মনোরমা!
এস এস চৌদিক উজলি
হরষ আনন্দ দাও ঢালি।
বসে আছি তোমার আশায়,
এস দেবী পুণ্যের প্রভায়। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী

* অগ্রজের বিবাহোপলক্ষে ১৩২৫ সালে লিখিত। জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রাতৃবধূর নাম।

বনের গান।

'সে যে আরতো ফিরে এলো না গো"

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একবার পশ্চিমাঞ্চলে গিয়াছিলাম। ইটাবা সহরে দেখিতে দেখিতে যমুনাতটে বেড়াইতে যাই। সহর ছাড়িয়া যমুনার তট ধরিয়া অনেক দূর চলিয়া গেলাম। শ্যামযমুনার শ্যামলশোভায় কত কথাই মনে হইল। তটের উপরে অদূরে এক বনভূমি। শাল তাল তমাল পিয়াল প্রভৃতি বড় বড় গাছ। তটপ্রান্তে প্রকাণ্ড একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ। তাহার শাখায় শাখায় নব নব কচি কচি পাতা। বৈশাখের সরস মধুর হিল্লোলে বনভূমিকে নবপ্রাণে অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে। পাখীগুলি বড় বড় গাছের শাখায় বসিয়া সুমধুর কলতানে ক্ষুদ্র বনভূমি খানিকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। সন্ধ্যা রবির রক্ত রাগ শ্রীযমুনার শ্যামসলিলে কনককান্তি বিস্তার করিয়াছে। এমন পরিষ্কৃত সুন্দর বনভূমি আমি আর কখনও দেখি নাই। যমুনাতটে বসিয়া—কত কি ভাবিতে লাগিলাম। সহসা সেই বিশাল বপু অশ্বত্থের পূর্ব্বধার হইতে অতি মৃদুল মধুর একটী গানের ধ্বনি আসিল। আমি আরও একটুকু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম—অশ্বত্থ বৃক্ষের ঠিক পূর্ব্ব ভাগে এক খানি ক্ষুদ্র কুটীর। উহার দ্বার রুদ্ধ। এই রুদ্ধদ্বার কুটীর হইতে গানের সুমধুর ধারা, কলকণ্ঠ বিহগ-কূজনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এই ক্ষুদ্র বনভূমিকে আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছে।

গানটা বাঙ্গালা; কণ্ঠরবও বাঙ্গালীর। আমি কুটীরের অতি নিকটে নীরবে স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া গান শুনিতে লাগিলাম। কুটীরবাসী গাহিতেছিলেন—

আমার মনসাধ না পুরিতে
শ্যাম গেল মধুপুরীতে
ত্বরিতে আসার আশা দিয়ে;—
প্রাণ সজনি গো!
আমার প্রাণ র'লো তার আশা বন্ধ
হ'লো গো তার আসা বন্ধ,
(সে যে আস্‌বে বলে আরতো
ব্রজে এল না গো)
বুঝি কার আশা বন্ধ হয়ে'—প্রাণ সজনি গো!
সেত আর এল না গো।

এটি আমাদের প্রাচীন গান—আরও কত বার কত জনের মুখে শুনিয়াছি—তখন তো ইহার ভাব-রস কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু সে দিন এই গান শুনিতে শুনিতে প্রাণটা এমন অধীর ও অবশ হইয়া পড়িল যেন আমি আর আমাতে ছিলাম না।

ব্রজ-বিরহিণীর অতৃপ্ত বাসনা-বিজড়িত এই কোমল করুণ বিলাপে আমার হৃদয় বিদ্ধস্ত হইয়া পড়িল। মনে হইল গানের প্রতি শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি গায়কের নয়ন-অশ্রু, নয়ন তটের বাঁধ ভাঙ্গিয়া তাঁহার গণ্ডস্থলে মণিমুক্তার মোহন মালা গাঁথিয়া

নিয়ে গড়াইতে ছিল, কণ্ঠস্বর গদ্‌গদ। সেই গদ্‌গদ কণ্ঠে গানটী কখনো পরিস্ফুট হইতেছিল, কখনো বা অস্ফুট ভাবে গায়কের কণ্ঠেই মিলিয়া যাইতেছিল।

তখনও সন্ধ্যা হয় নাই, গান শুনিতে শুনিতে মনে এক বিচিত্র ভাবনার উদয় হইল। মনে হইল—শ্যামসুন্দরের এ কি লীলা! তিনি তাঁহার প্রিয়জনের হৃদয়ে এ বিরহ-বেদনা জাগাইয়া দিয়া কি আনন্দ পান? অথবা প্রেম রাজ্যের রীতিই বুঝি,—বিরহ! বিরহ না থাকিলে প্রেমের মাধুর্য্য অনুভূত হয় না—তাই কি এ বিরহ! অপূর্ণ-বাসনায় প্রিয়জনের বিরহ, চিত্তকে যে এত ব্যাকুল করে ইহা স্বাভাবিক। সেই ব্যাকুলতায় মিলন-বাসনা ক্রমশঃই তীব্র হইয়া দাঁড়ায়—প্রতি মুহূর্ত্তেই দর্শনাকাঙ্ক্ষার বেগ বাড়ে, চিত্ত তন্ময় হইয়া যায়। এই অবস্থায় মিলন অবশ্যম্ভাবি—সে মিলন আবার অতি মধুর।

কিন্তু মিলন কেমন, তখন সে ভাবের লেশও আমার মনে আসিল না। কেবল আমার মনে এই এক কথা শতবার ঘুরিয়া ফিরিয়া ধ্বনিত হইতে ছিল—

"সে যে আসবে ব'লে
আর ত ব্রজে এল না গো"।

এ কি বিস্মরণ! এ কি নিঠুরতা! দিন যায় রাত্রি হয়, নীল আকাশে চন্দ্র তারা উঠে, ঊষার কনক রাগে আবার বনভূমি বিহগ কলতানে মুখরিত হয়—কিন্তু বিরহিণীর—চির বাঞ্ছিত ধন—আর ত ফিরে আসে না! প্রকৃতির বিশাল বক্ষে অনন্ত

পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রতি মুহূর্ত্তে বহিয়া যায়—কিন্তু বিরহিণীর বুকে অই একতান—এক কলকল্লোল—আর ত ফিরে এল না গো".!

'আমার প্রণ র'লো তার আশা বদ্ধ
হ'লো গো তার আশাবদ্ধ
"সে যে আস্‌বে বলে আর তো
ফিরে এল না গো"।

বিরহিণীর কেবল ইহাই জপ, ইহাই তপ, ইহাই শ্রবণ, ইহাই কীর্ত্তন, ইহাই স্মরণ মনন নিদিধ্যাসন।—"সে যে আরতো ফিরে এলো না গো"। চণ্ডীদাসের পদে শুনিয়া ছিলাম—

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ"

এই গানের তানে আমার প্রাণেও কতকটা এই দশা ঘটিল। অজানা বিরহ সহসা নূতনভাবে নূতনবেশে আমার প্রাণের কঠিন কপাট ভাঙ্গিয়া চিত্তের অন্তস্তলে প্রবেশ করিল। কাহার বিরহ আমায় এমন করিল, চকিত চিত্ত বিরহ-ব্যথায় এমনি ভাবে অধীর হইল যে তাহা আর বুঝিতে পারিলাম না। পরমারাধ্য পিতার বিরহ নয়, স্নেহময়ী মাতার বিরহ নয়, শৈশবসখা সহোদরের বিরহ নয়—যৌবন সঙ্গিনী প্রিয়তমা পত্নীর বিরহ নয়—বার্দ্ধক্যে প্রাণাধিক সহচর যুবকপুত্রের বিরহ নয়—এ সকল ক্রমে ক্রমে সহ্য করিয়াছি, ক্রমেই চিত্ত এ সকল বিরহ-বেদনা সহিতে শিখিয়াছে। কিন্তু সেদিন যমুনা তটে কুটীরবাসীর গানের তানে এ বজ্র কঠোর হৃদয়ে এই এক নববিরহের ঝঙ্কার জাগাইয়া তুলিয়াছে।

উহা নব বৈধব্যের বিরহ অপেক্ষাও অধিকতর তীব্র ; ছাড়িতেও পারি না—সহিতেও পারি না। শ্রীচরিতামৃতের ভাষায় বলিলে বলিতে হয়,—সে যেন "বিষামৃতে একত্র মিলন! যেন তপ্ত ইক্ষু-চর্ব্বণ মুখজ্বলে না যায় ত্যজন"। পূর্ব্বে আমার চিত্ত এমন ছিল না, তখন বিচার-বুদ্ধি ছিল,—এখন সে সব হারাইয়া একবারেই যেন কি-জানি-কেমন হইয়াছে। কথায় কথায় হৃদয় উতালা হইয়া পড়ে। এমন ভাবে আর সংসার করা চলে না! যাউক, সে কথা।

কুটীরের বিরহ-সঙ্গীত নীরব হইল। আমি কুটীরবাসীর দর্শনের আশায় বসিয়া রহিলাম। কিন্তু সে রুদ্ধদ্বার আর উন্মোচিত হইল না। সে প্রতপ্ত নয়ন অশ্রু আপনি ঝরিয়া বুঝি সে বিরহ পাণ্ডুর গণ্ডে আপনি শুকাইয়া গেল—বুঝি সে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস আপনি বহিয়া আপনি মিশাইয়া গেল—উহা জগতের সহানুভূতির অপেক্ষা করিল না—জগতের সহিত বুঝি উহার কোনও সম্বন্ধ সংশ্রব নাই! উহা আরণ্যকুসুমের ন্যায় নির্জ্জন নীরবতায় আপনি ফুটিয়া আবার নির্জ্জনে নীরবকণ্ঠে আপনি লয় পাইল। ভাবিলাম—তবে আমি কেন আর এ মহাযোগীর মহাধ্যান ভঙ্গ করিব? এই ভাবিয়া সেই বিরহের কোমল করুণস্বরমাখা মর্ম্মবেদনা হৃদয়ে লইয়া বাসায় ফিরিলাম কিন্তু চিত্তে বসিয়া কে যেন নিরন্তর গাইতে লাগিল—"সে যে আরতো ফিরে এলো না গো।"

শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমা

১

আবার বরষ পরে সে তিথি ফিরিল,
সবে গাও হরিনাম ;
ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি, আসিলেন যবে প্রভু
বাঙ্গালায় গৌর গুণধাম।
প্রেম ভকতি দিয়ে হরিনাম গাওয়াইয়ে
জীবের করিতে পরিত্রাণ,
ধরাতে এলেন গোরাচাঁদ।
জাগাও আনন্দ রোল গাও হরি হরিবোল
প্রেম-ভকতিময় পুণ্যময় গান।
ধরাতে এলেন গোরাচাঁদ।
অনন্ত বিশ্বের কেন্দ্রে বাজিছে মোহন মন্ত্র
গৌর গুণমাখা ওই সুমধুর নাম।
সে স্বরে মিশা'য়ে স্বর ভরপুর প্রাণে,
মজরে আনন্দে সবে গৌর-গুণ গানে।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী,
২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট।

নিশ্চিন্ত

মনের সাধ নিশ্চিন্ত হই, কিন্তু পারি কই! দুশ্চিন্তা করিয়া যে কোন ফল নাই, তাহা বুঝি,—চিন্তা করি এক,—ভাবিয়া রাখি এক, কিন্তু ঘটে, আর! ইহাইতো জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা। কিন্তু তথাপি দুশ্চিন্তা ছাড়িয়া, হে প্রাণের পরমদেব—তোমায় চিন্তা করিতে মন যায় না। এরূপ কেন হয়, তাহা আমি যে একেবারে বুঝিতে না পারি, তাহা নহে—কিছু কিছু বুঝিতে পারি বলিয়াই বিস্মিত হই না।

এরূপ কেন হয়—শুনিতে পাই শাস্ত্রকারগণ এসম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন—কর্ম্ম, অজ্ঞান, অবিদ্যা, মোহ, অহঙ্কার ইত্যাদি বিবিধ নামে একই হেতুর উল্লেখ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। আমি উহার একটি নামেরও সার্থকতা বা সৎযুক্তি খুঁজিয়া বুঝিয়া লইতে পারি না। তুমি দয়াময় জীবের হৃদয়ে চিরবিরাজমান আছ,—তবে এত দুশ্চিন্তা কেন? এত আকাশ-পাতাল ভাবনার কি প্রয়োজন? দুশ্চিন্তাগুলি ভীষণ অনর্থের মূল—বিভীষিকার মূল।

কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

হরি হরি—এ কি বিভ্রাট—এ কি যাতনা! পলকে স্বর্গ,—পলকে নরক দেখিতে দেখিতে হাসি কান্নায় ফুটিয়া উঠে! আশা নৈরাশ্যে

ডুবিয়া যায়—আলোক অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া চিত্তকে সহসা বিষন্ন করিয়া ফেলে।

এইরূপ আলোক-আঁধারে আশায়-নৈরাশ্যে ও হাসি কান্নার মধ্য দিয়া মানুষের জীবন স্রোত অনন্তকাল প্রবাহিত হইতেছে—সংসারটা এইরূপেই লোকের উপলব্ধির উপরে হাসি-কান্নার বিমিশ্র রেখা সম্পাত করিয়া এক বিচিত্র ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছে। অতি অল্প লোকেই ইহার রহস্য ভেদ করার প্রয়াস পায়, অতি অল্প লোকেই এই তোলাপড়ার বিপদ্ হইতে আত্ম-নিষ্কৃতির সন্ধান করে।

আবার জিজ্ঞাসা করি কেন এমন হয়—কৃপাময়—বুঝাইয়া দাও—কেন এমন হয়! একদিন জগৎজীবের হিতের জন্য তোমারই প্রিয়তমপার্ষদ শ্রীপাদ সনাতন তোমায় জিজ্ঞাসা করেন—

কে আমি আমারে কেন জারে তাপত্রয়,
ইহা না জানিলে জীবের কৈছে হিত হয়।

ইহা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা—আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা ও দুঃখ-তত্ত্বজিজ্ঞাসা। কিন্তু এ তত্ত্বজিজ্ঞাসায় আমার কোনও অধিকার নাই, যাহা বুঝাইলেও বুঝিব না—যাহাতে বুদ্ধির প্রবেশ হইবে না, তাহার আলোচনা আমার পক্ষে বিড়ম্বনা। আমি অত কথা বুঝিতে পারি না। তবে তুমি শ্রীসনাতনের জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে যে কথাটী বলিয়াছিলে, সেটি আমার মনে ধরে—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
এ কারণে মায়া তারে দেয় সংসার দুখ॥

আমার মনে হয় কথাটি ঠিক। তুমি আনন্দময়—তোমায় ভুলিলেই দুঃখ, তুমি জ্ঞানময়—তোমায় ছাড়িলেই অজ্ঞান; তুমি জ্যোতির্ম্ময়—তোমায় পশ্চাৎ রাখিলেই অন্ধকার। এই তো ঠিক। আর তত্ত্ব-বিচারের প্রয়োজন নাই। এখন কথা—তোমাতে আর আমাতে! ওগো সর্ব্বজ্ঞ—এখন বল দেখি,—আমি কি তোমায় পাইতে চাই না? আমি কি তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে ভালবাসি? তুমি কি আর জান না, যে আমি যদি তোমায় পাই, তবে জগতের আর কিছুই চাই না। যাহাকে ফাঁসী কাষ্টে ঝুলাইয়া নিহত করার জন্য পরিচালিত করা হইতেছে, কুবেরের ধন তাহার চরণতলে ঢালিয়া দিলে সে কি কখনও তাহাতে তৃপ্ত হয়? সে জানে তাহার জীবনকাল পাঁচমিনিট অপেক্ষা কম।

আমি কি আর জানি না যে আমি অগ্নিশিখাভিগামী পতঙ্গের ন্যায় দ্রুতবেগে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হইতেছি। আর এখানে কত দিন থাকিব? এ দেহ লইয়া কামনা লইয়া এখানকার আশা নৈরাশ্য হাসিকান্না ও আলোক আঁধার লইয়া আর কতকাল থাকিব? আমি কি এখনও ইহার পরিণাম বুঝিতে পারি নাই? তোমায় যথার্থই বলিতেছি—আর বলিবই বা কি? তুমি হৃদয়েশ্বর, হৃষিকেশ, তুমি তো সকল জান—যদি তোমায় পাই তবে এখানকার বা পরলোকের কোন কিছুই চাই না! আমি কেবল তোমাকেই চাই—আমার প্রাণের সখা তোমার মধুমাখা রূপ—মধুমাখা ভাবা—আমার চিত্তের ভরপুর আনন্দ।

বলিতে পার "আর দুশ্চিন্তা কেন? তুমিই তো আমাকে চিন্তা কর—তবে দুশ্চিন্তা কেন?" এই প্রশ্নেই যত গোল। তোমাকে চিন্তায় আনিতে পারি না বলিয়াই দুশ্চিন্তা। তুমি এখন আমার সর্ব্বচিন্তা বেদখল করিয়া দিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও—তাহা হইলেই আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি। প্রাণের ঠাকুর এখন নিশ্চিন্ত কর।

তোমার বিধান

তোমার বিধান হইবে পূর্ণ
আমার কল্পনা ভুল;
বাসনার দ্বার করহে রুদ্ধ,
যত অবিদ্যার মূল।
আমার কল্পনা করহে চূর্ণ
অশান্তি উদ্বেগময়;
তোমার ভাবেতে হউক পূর্ণ
দিবানিশি এ হৃদয়।
সুখ দুঃখ দুই মোহের তরঙ্গ
প্রশান্ত করহে প্রভু,
হউক বাসনা- শৃঙ্খল-ভঙ্গ
না ভুলি তোমারে কভু।

তুমি সুবিজ্ঞ সুদূর-দর্শী
সতত মঙ্গলময়,
আমি মূঢ়মতি মহামোহান্ধ,
কি বুঝি মঙ্গলাশয়!
চিত্তের ঘোর করহে দূর
দয়াময় অবতার,
তোমাকে লইয়া ভাবনা সকল
রহে যেন অনিবার।

শ্রীকালীদাসী দেবী।

সমতা

বিহগ কণ্ঠে তোমারি মধুর
নিঃস্বন মৃদু তান;
ভীম গরজন বরজ-নিনাদে
তোমারি ভৈরব গান।
তোমারি শব্দ বিশ্ব ব্যাপিয়া
কোমল কর্কশ যত;
মান অপমান সকলি সমান
উন্নত অবনত।

তোমাকে লইয়া বিভোর যাহারা
তুমিই তাদের প্রাণ,
যশ অপযশে স্তবনে নিন্দনে
তাহারা না দেয় কাণ।
নিন্দকে স্তাবকে সমান আদর
তাহারা সতত করে,
ভালতে মন্দতে তোমারি প্রকাশ
তাহারা নিয়ত স্মরে।
রোগ-শোকজ্বালা যত ঝালাপালা
উতালা করয়ে প্রাণ;
তোমার সরস চরণ পরশে
রহে না সে দুখ-জ্ঞান।
হরষ-বিষাদ আলো অন্ধকার
সকলি জ্ঞানের ভুল,
তোমার চরণে সকলি সমান
তুমি আনন্দের মূল।
পূজন নিন্দন মান অপমান
সকলি তোমারি ভাষা,
মধুর মধুর যেন বলি, ভাবি,—
পুরাও মনের আশা।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।

শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধান

"বাঁশী বাজে গো অনেক দিনে
নাম ধ'রে মন চোরের বাঁশী বাজে বিপিনে"

প্রাণে তো সুখ নাই—সদাই জ্বালা! ঘর ছে'ড়ে বনে এলেম,—জ্বালা গেল না—বাড়িল বই কমিল না। বনের মাঝে ছোট ছোট লতা—তাহাদের শ্যামল সবুজ সরস পাতার আড়ালে আড়ালে সাদা সাদা ছোট ছোট ফুল, কেমন সরল সরস ও সুন্দর! মনে হয় কাহাকেও ডাকিয়া দেখাই। এ শোভা দেখাইবার মানুষ খুঁজিয়া পাই না। সকলেই অন্ন বস্ত্র লইয়া—ভোগ বিলাস লইয়া—মান যশ লইয়া ব্যস্ত—ঘর ছাড়িয়া বন চায় না—দালান কোঠা ছাড়িয়া এ ছোট জিনিস কে দেখে!

কিন্তু নিভৃত নীরব নিকুঞ্জ কুটীরে যে আনন্দ, ঐশ্বর্য্যময় প্রাসাদে সে আনন্দ নাই। বহুদিন প্রাসাদে ছিলাম—সে উত্তেজনায় উন্মাদনায়, লাঞ্ছনায় ও বিড়ম্বনায় হৃদয় ক্লান্ত হইয়া ছিল। সেখানে একদিনও প্রিয়তমের সন্ধান পাই নাই। আমি শান্তি খুঁজিয়াছি কিন্তু আমার শয্যার দংশমশক প্রতি নিশায় আমায় শয্যায় থাকিতে দেয় নাই, দিবা ভাগেও আমার সংসার-রাণী উৎত্রাস দণ্ড হাতে লইয়া সর্ব্বদাই চমকাইয়া তুলিতেন। তাই ভয়ে ভয়ে বনবাসে আসিয়াছি।

এখানে আসিয়া কয়েক দিন ছিলাম ভাল, মনে শান্তি ছিল। নির্ঝরের জলে, বনের ফলে দেহের অভাব মিটাইয়া আমার

ভজন-তরুর স্নিগ্ধ ছায়ায় একরূপ ভালই ছিলাম। কিন্তু হৃদয় একাকী থাকিতে জানে না,—দোসর চায়। আমি লতা পাতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বন-বিহঙ্গের কল-কূজনে শ্রবণ দিয়া সে অভাব দূর করিতাম। কিন্তু কয়েক দিন পরে দেখিতে পাইলাম নব কিশলয় গুলি ছোট ছোট শাখার কাষ্ঠ-জঠর ভেদ করিয়া বাহিরের দিকে উঁকি দেয়—আলোক রেখার পিপাসায় আকাশের দিকে তাকায়—ক্ষুদ্র প্রাণের কেমন বলবতী পিপাসা—ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রবল লালসা—যেন আলোক বিন্দু না পাইলেই নয়।

দেখিয়া দেখিয়া আমার মনে ক্রমেই কেমন একটা অজানা পিপাসার বেগ দেখা দিল। আমার মনে হইল—সুকোমল কিশলয়াঙ্কুর এমন ব্যাকুল ভাবে বাহির হইয়া পড়ে কেন? এই ক্ষুদ্র অঙ্কুর কি নিজের ইচ্ছায় বাহিরে আসে অথবা কাহারও আহ্বানে উহা বাহির হয়।

আমি তখন নীরবে নীরবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম—সুকোমল কিশলয়, তুমি কাহাকে চাও,—তুমি এত আকুল প্রাণে কাষ্ঠদেহ ভেদ করিয়া কোন্ লালসায় প্রপঞ্চে প্রকটিত হইতেছে।

বুঝিলাম উহাতেও লালসা আছে,বীজ হইতে যখন অঙ্কুরোদ্গম হয়, তাহাও লালসারই প্রেরণা—উদ্ভিদ রাজ্য ছাড়িয়া জীবরাজ্যে এই লালসা নানা ভাবে বিজড়িত হইয়া প্রকাশ পায়। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম এই লালসার মূল কোথায়? ইহার উদ্বোধক কে?

ভাবিয়া বুঝিলাম ভিতরে যিনি, বাহিরেও তিনি। বাহির

হইতে তিনিই এস এস বলিয়া ডাকিতেছেন, ভিতরেও লালসারূপে তিনিই অবস্থান করিতেছেন। একই রস—আশ্রয় ও বিষয়রূপে লীলা-বিস্তার করিয়া জগৎকে মুগ্ধাবস্থায় রাখিয়াছেন।

বীজাঙ্কুরে লতায় পাতায়, ফুলে ফলে, কীট পতঙ্গে, পশুপক্ষি-মানুষ দেবতায় ঐ এক বস্তুই অন্তরে লালসারূপে এবং বাহিরে আকর্ষক রূপে লীলার জাল বিস্তার করিয়াছেন। বাহির হইতে যখন তাহার ঘন ঘন ডাক আসে, তাহা কেহ উপেক্ষা করিতে পারে না। যে মুরলী-রব শুনিয়া ব্রজ-বধূরা, ঘরের বাহির হইয়া-ছিলেন, সেই মুরলীর মোহন রবেই বীজ হইতে অঙ্কুর বাহিরে আসিয়া পড়ে। বাহিরের আহ্বান ও ভিতরেব লালসা উভয়ে এক হইয়া একই কার্য্য সম্পন্ন করে।

লতা পাতা ছাড়িয়া নিজের কুটীরে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম —কই আমি তো সে ডাক শুনিতে পাই না, আমার ভিতরে সে লালসা নাই কেন? এই চিন্তার জ্বালা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। কিন্তু কোথা হইতে তখনও কোন সাড়া আসিল না।

এক দিবস মাধবী নিশায় আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখা দিল। আমার কুটীরের চারিদিকে নানা জাতীয় ফুল, আঙ্গিনায় শ্যামল দূর্ব্বাদল, মাঝখানে একটী আমের গাছ। উহার মূলে একটী চতুষ্কোণ বেদী। আমি বেদী ঠেশ দিয়া ঝিমাইতে ছিলাম—কি ভাবিতেছিলাম তাহা ঠিক মনে নাই—চাহিয়া দেখি সম্মুখে একদল উজ্জ্বল মূর্ত্তি যুবা পুরুষ—সকলই তরুণ যুবক; পায়ে নূপুর, হাতে বীণা। তাঁহাদিগকে দেখামাত্রই আমার ভক্তির উদয়

হইল। আমি ভক্তিভরে তাঁহাদের চরণসমক্ষে মস্তক লুটাইলাম। তাঁহাদের মাধ্য একজন অতি দয়াল। তিনি বলিলেন তোমায় তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে ডাকিতেছেন, তুমি শুনিতে পাও না। তাই আমি তোমায় শুনাইতে আসিয়াছি।

এই বলিয়া তিনি আমার কর্ণমূলে একটি অশ্রুত পূর্ব্ব বীজাত্মক মন্ত্র বলিয়া দিয়া অপরাপরের সহিত তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান করিলেন। সে দিন হইতে আমার মনের জ্বালা শতগুণে বাড়িয়াছে। এখন সর্ব্বদাই কে আমায় বাঁশীতে ডাকে "এস এস"।

কোথা হইতে কে ডাকে কোনও সন্ধান পাই না, কি সন্ধানে তাঁহার নিকটে যাই, সে সন্ধানও জানি না। ঘর ও বন এখন উভয়ই আমার সমান।

লীলা।

বলো না আমায়,— 'জগত মিথ্যা'
ব্রহ্মবাদীর দল!
রবি চন্দ্র তারা নীলিম আকাশ
নদ নদী ফুল ফল।
নহে গো মিথ্যা; সকলি সত্য,
সুন্দর মনোহর;
পরম সত্যের শকতি প্রকাশে
শাশ্বত চরাচর।
তাঁহারি লীলা, তাঁহারি মহিমা
বিশ্ব ভরিয়া রয়;

এ বিশ্বে তাঁহার অনন্ত প্রকাশ
পরিস্ফুট অতিশয়!
গন্ধে গন্ধে তাহারি গন্ধ
আকুলিত করে প্রাণ
জ্যোতিতে জ্যোতিতে তাঁহারই জ্যোতি
শব্দে তাঁহারি গান।
রসে রসে তাঁর সুধার লহরী
উথলি উথলি উঠে,
আকাশেতে চাঁদ কাননে কুসুম
সে রস-পরশে ফুটে।

শ্রীকালীদাসী দেবী।

কর্ম্মফল।

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জানোঽএবাত্মকৃতং বিপাকম্।"

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল-ভোগ,—আমাদের চিন্তার একরূপ ধারায় সত্য বলিয়াই মনে হয়। এখানে আমরা যে সকল সুখ দুঃখ ভোগ করি, তাহা কর্ম্মকৃত। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম-ভঙ্গ করিলে শরীর অসুস্থ হয়, নৈতিক ও সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করিলে তজ্জন্য দৈহিক ও মানসিক দণ্ডভোগ করিতে হয়। এই জীবনেও এই দেহে আমরা এই সকল ফল ভোগ করিয়া থাকি, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগও এইরূপ অনিবার্য্য।

আত্মার পুনর্জ্জন্ম না হইলে এই কর্ম্মভোগের প্রশ্নই ঘটিতে পারে না। যাঁহারা পুনর্জ্জন্মবাদ স্বীকার করেন না, কর্ম্মফলভোগ বোঝেন না, মানব জীবনের গূঢ় প্রহেলিকার মর্ম্মভেদ করা তাহাদের বিচারের অতীত,—বুদ্ধির অতীত।

"কর্ম্মানুসারিণী. বুদ্ধি"—একথাটিও এখন খাটি বলিয়াই মনে হইতেছে। কর্ম্মানুসারেই সংসারে গৃহস্থের স্ত্রী পুত্রাদি ও বিষয়াদি লাভ হইয়া থাকে। তাহাদের দ্বারা মানুষ আপনার কর্ম্মফল ভোগ করিয়া লয়। কোনও সংসারে দেখা যায়, স্ত্রীটি সর্ব্বতো-ভাবেই স্বামীর মনের মত, ভক্তি-প্রীতিতে স্নেহানুরাগে সর্ব্ব বিষয়েই স্বামীর মনোমদা ও প্রীতিপ্রদা,—পুত্রটি পিতৃভক্ত সুশীল শিষ্ট ও সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন—জীবিকার উপায়ও সুখানুকুল। এই সংসার সুখের সংসার। এ স্থলে বলিতে হয়—গৃহস্বামীর কর্ম্মফল ভাল।

আবার অপর পক্ষে অপর সংসারে দেখা যায়, স্বামী ও স্ত্রীতে সর্ব্বদা কলহ। পুত্রটি উচ্ছৃঙ্খল, নিষ্ঠুর, দৌরাত্ম্যপ্রিয়, নির্ব্বোধ, অশিষ্ট; জীবিকার উপায়ও ভাল নয়, এক্ষেত্রে গার্হস্থ্য যেন এক ঘোরতর নরক। এ স্থলে বলিতে হয় গৃহস্বামীর পূর্ব্বজন্মকৃত ও ইহজন্মকৃত কার্য্যগুলিই তাহার এই নরক-যাতনার হেতু। এরূপ স্থলে কেবল গৃহস্বামী বলিয়া নয়, তাহার গৃহে যাহারা তাহার সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়া উপস্থাপিত হয়, তাহাদের আত্মাও দুষ্কৃতিশালী ছিল। এইরূপ গৃহস্বামীর সংসারে থাকিয়া তাহারা নিজেরাও কষ্ট পায়, গৃহস্বামীকেও কষ্ট দেয়।

এইরূপে গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-দুঃখ ভোগসম্বন্ধে কর্ম্মফল-ভোগবাদীদের সিদ্ধান্ত আমাদের শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ এই বাক্য স্বীকার করিলে কাহারও উপরে কাহারও অপবাদ করা চলে না। সকলেই আপন আপন কর্ম্মফলভোগ করে। সেই ফলভোগের জন্য অপর ব্যক্তি কেবল নিমিত্ত মাত্র হয়। সুতরাং তজ্জন্য অপরকে দোষী করা সুসঙ্গত নয়। তখন এই বলিয়াই মনের প্রবোধ দেওয়া কর্ত্তব্য যে আমি যেমন কর্ম্ম লইয়া আসিয়াছি, যেমন কর্ম্ম করিতেছি, আমার প্রতি ঠিক সেইরূপ ব্যবহারই হইতেছে,—এ সকল তো আমারই স্বকৃত কর্ম্ম-ফলের ভোগ। এ জন্য অপর কোন ব্যক্তিই দোষী নহে।

ইহার উপরে আরেও একটুকু সান্ত্বনা আছে, সে সান্ত্বনা এই যে, আমি এরূপও মনে করিতে পারি, যে আমার দুষ্কৃতি এতই অধিক যে তজ্জন্য প্রতিমুহূর্ত্তে আমার আরও ভীষণ ক্লেশজনক নরক-যাতনা ভোগ করা উচিত ছিল, কিন্তু আমার তো সেরূপ দুঃখ হইতেছে না, আমি তো এই নরক-যাতনার মধ্যেও অনেক সময়ে এখানকার সুখ-সমৃদ্ধি যথেষ্ট ভোগ করিতে পারিতেছি। যাহাদিগকে স্নেহ যত্ন করি না, তাহারাও তো সময়ে সময়ে আমাকে স্নেহ যত্ন করিতেছে, যে শরীর আমার কর্ম্মফলে রোগ-জীর্ণ হওয়া উচিত ছিল, তাহাও তো স্বাস্থ্য ভোগ করিতেছে। আমার কর্ম্মফলে স্ত্রী-পুত্র লইয়া অনাহারে থাকাই আমার ঘোর দুষ্কৃতির ফলে অবশ্যম্ভাবী ছিল, তাহা তো হইতেছে না। দুই বেলাই তো, যাহাতেই হউক, উদরপূরণ হইতেছে।

এই সকল ব্যাপার হইতে মনে সান্ত্বনা হওয়া কর্ত্তব্য—আর একটি জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি এই হয় যে একজন কেহ আছেন, যিনি পিতার মত দয়া করিয়া আমার কর্ম্মফলকে লঘু করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই আমার ক্লেশভার হ্রাস করিতেছেন। এ স্থলে কর্ম্মভোগ করিতে করিতেও তাঁহারই অনুকম্পার কথাই মনে পড়ে। কর্ম্মের কথা তো মনে পড়েই, কিন্তু কর্ম্মফলসমূহ লঘু করিয়া যিনি এই তাপদগ্ধ জীবনে শান্তি প্রদান করেন, তাঁহার কথাও মনে পড়ে।

এইটুকু যখন মনে পড়ে, তখন দুঃখের মধ্যেও পরমাশান্তি, তখন বাস্তবিকই দুঃখের কর্ম্মফল-ভোগ তুচ্ছ হয়। তখন মনে হয়, আমি অধম পাষণ্ড হইলেই জগদীশ, তুমি পরম দয়াল। সাধুরা তোমার এই দয়া স্মরণ করিয়াই সুখে সময় অতিবাহিত করেন এবং কায়মনোবাক্যে তোমারই শ্রীচরণের শরণ গ্রহণ করেন; পরিণামে তাহার ফলেই তাঁহারা কর্ম্মভোগ ক্ষয় করিয়া থাকেন। ফলতঃ এই কর্ম্মভোগের মধ্যেও যাঁহারা শ্রীভগবানের অনুকম্পা স্মরণ করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহারাই কর্ম্মভোগ অবসান করার উপায় প্রাপ্ত হয়েন।

ভজন

বেদবেদান্ত, পুরাণতন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থে ভগবদুপাসনার উপদেশ প্রবৃত্ত হইয়াছে। অধিকারিভেদে উপাসনার প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং উপাসনার উপদেশও বহুবিধ। উপাসনার প্রণালী বহুবিধ হইলেও উদ্দেশ্য প্রধানতঃ এক।

জগতের অনন্তব্যাপারে মানুষ তাহার চিরসুহৃদ প্রিয়তম বন্ধুকে ভুলিয়া থাকে। এই সকল ব্যাপার হইতে চিত্ত একটুকু অবসর পাইলেই সহসা সেই চিরমধুরের ক্ষীণস্মৃতি চিত্তের নিভৃত-স্তরে জাগিয়া উঠে। সেই নিত্য সুহৃদের সমীপে অবস্থান করিয়া তাঁহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল মাধুর্য্যসম্ভোগস্পৃহা,—উপাসনার এক প্রধানতম নিদান। ভক্তিশাস্ত্রে এই অবিচ্ছিন্না অব্যভিচারিণী স্পৃহা অনুরাগ নামে অভিহিত হইয়াছে।

অনুরাগ না হইলে ভজন হয় না। সাধনে ভগবৎ-উপাসনার প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে, তাদৃশ ব্যাপারজাত কার্য্যাবলীকে বৈধ্য ভক্তিও বলিতে পারি; কিন্তু ভজন বলিতে পারি না। ভজ ধাতু হইতেই ভক্তি ও ভজন পদের উৎপত্তি। কিন্তু তথাপি আমি ভজনকে বৈধী-ভক্তিতে অভিহিত করিতে ইচ্ছা করি না। আমার মনে হয়, পূর্ব্বাচার্য্যগণ ভক্তিশব্দকে যেরূপ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত করিয়াছেন, ভজন শব্দটী সাধক-সমাজে সেরূপ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। ভক্তি কর্ম্মে আছেন, ধর্ম্মে আছেন,

স্থানে আছেন, ধ্যানে আছেন,—কিন্তু ভজন আরও উচ্চতর স্থানে অবস্থান করেন।

ভজন একনিষ্ঠ, নির্জ্জনপ্রিয়, আপনভাবে আপনি বিভোর। জাহ্নবী-ধারা যেমন একপ্রাণে একটানে শ্যামসাগরের অভিমুখে ধাবিত হয়, ভজনও তেমনি অনবচ্ছিন্ন গতিতে শ্যামসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মের অভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া অগ্রসর হয়। মহাযোগীর মহাযোগের যাহা চরম ফল—ভজন তাহারও ঊর্দ্ধে বিচরণ করিয়া নন্দকুলচন্দ্রমার আনন্দ-সুধাপানে বিহ্বল হয়।

ভজন কখনও বা সন্ত-বিরহ-বিধুরা প্রেমবতীর ন্যায় আকুল-ব্যাকুলভাবে স্বীয় হৃদয়রঞ্জনের জন্য উন্মত্ত হন, আবার কখন বা প্রিয়সোহাগিনী প্রিয়বক্ষোবিলাসিনীর ন্যায় আনন্দে আত্মহারা হইয়া বর্ষার দ্বিকুল-সংপ্লাবিনী ভরা গঙ্গার ন্যায় নিজের আনন্দ-তরঙ্গে নিজকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলেন; আবার অপর পক্ষে আপন বক্ষে সমস্ত শক্তি একেবারে লুক্কায়িত করিয়া নিস্পন্দ নিশ্চলভাবে অখিলরসামৃতের রসাস্বাদনে মাতিয়া থাকেন। বিষয়ের মধ্যে অবস্থান করিয়াও ভক্তির অঙ্গবিশেষের অনু-শীলন সম্ভবপর হয়। কিন্তু বিষয়ের সেবা করিয়া ভজন চলে না। ভজন অপরের সহিত মিশিয়া মিশিয়া বিষয়-নীতি মানিয়া বুঝিয়া চলিতে সম্মত নহেন।

ব্রহ্মজ্ঞান, ভজনের পরিচারক। বৈধী ভক্তি ইহার পরি-চারিকা। ব্রহ্মজ্ঞানানন্দ, ভজনানন্দের বহু নিম্নে। ভজননিষ্ঠ চিত্ত রসরাজের রস-সুধায় নিত্য অভিষিক্ত, সরস ও

সম্পৃক্ত। ব্রহ্মজ্ঞান সে সরসতার আস্বাদনে একেবারেই অনধিকারী।

সোঽহং সাধনের ন্যায় ভজন দাম্ভিকতা জানে না, তাদৃশী দম্ভানুগামিনী প্রবৃত্তিও ভজনের নাই। ভজন কুসুমভারাবনত স্নিগ্ধলতিকার ন্যায় স্বীয় ভাবভরে জগৎ সমক্ষে অবলুণ্ঠিত হয়েন, লোক-লোচনের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন।

ভজনের নয়ন, অনুরাগের নিত্য নব নিরঞ্জনে সমুজ্জ্বল, সে নয়ন চিরদিনই আনন্দ-রসলীলা-বিগ্রহের চরণারবিন্দ-সন্দর্শনের জন্য নিয়ত ব্যাকুল। সেই ঢল-ঢল সজল সরস সুন্দর নয়ন, কঠোর হৃদয়কেও কোমল করিয়া উহাতে ভগবৎপ্রীতি অঙ্কুরিত করিতে সমর্থ।

আমরা বেদান্তে ব্রহ্মের উপাসনার কথা শুনিতে পাই। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বলেন শ্রুতিতে যে ব্রহ্মোপাসনার কথা আছে, সে উপাসনা সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনাই হয় না। যেহেতু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রমাণাতীত ও জ্ঞানের অগ্রাহ্য। পূজ্যপাদ শ্রীভাষ্যকার ভগবান্ শ্রীরামানুজাচার্য্য বলেন :—

"নির্ব্বিশেষবস্তুবাদী নির্ব্বিশেষবস্তুনি ইদং প্রমাণমিতি ন শক্যতে বক্তুম্; সবিশেষবস্তুবিষয়ত্বাৎ সর্ব্বপ্রমাণাম্।"

অর্থাৎ যাহারা ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলেন সেই নির্ব্বিশেষ বস্তুতে "এই প্রমাণ আছে" ইহা তাঁহারা বলিতে পারেন না। কেন না প্রমাণমাত্রই সবিশেষ বস্তুবিষয়ক। অপিচ এই নির্ব্বিশেষ বস্তু অনুভবেরও বিষয় নহে।

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদীরা বলেন অনুভবই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রমাণ। কিন্তু অনুভব ব্যাপারটী কি তাহার আলোচনা করিয়া দেখিলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদীদের এই উক্তির কোন সার্থকতা অনুভূত হইবে না। শ্রীপাদ রামানুজ বলেন :—"ইদমহমদর্শম্‌" ইতি কেনচিদ্‌ বিশেষণ বিশিষ্টবিষয়ত্বাৎ সর্ব্বেষামনুভাবানাম্‌।" অর্থাৎ আমি ইহাই দেখিয়াছি বা ইহাই জানিয়াছি" এইরূপে একটা কোন কিছুকে বিশেষিত করিয়াই সর্ব্বপ্রকার অনুভূত বস্তুর উপলব্ধি হয়। সুতরাং সবিশেষ অনুভব দ্বারা নির্ব্বিশেষ পদার্থের প্রতীতি একেবারেই অসম্ভব। সবিশেষরূপে এই অনুভূতমান অনুভবটীকে যুক্তির কোনও আভাসে যদি নির্ব্বিশেষ বলিতে হয়, আমরা বলিব তাহাতেও সবিশেষত্বের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই।

প্রকৃত কথা বলিতে কি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ধারণা একেবারেই সম্ভবপর নহে। অপিতু তাদৃশ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সাধনকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াও অসম্ভব। পদার্থতত্ত্বের আলোচনায় যুক্তিবলে যাহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা একটুকু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহাদের নিজের উক্তিতেই নিজেদের সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হইয়া পড়ে। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য তদীয় ভাষ্যে স্পষ্টতই লিখিয়াছেন যে, যাহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে প্রতীতির সম্বন্ধে স্বীয় অনুভবকে প্রমাণ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম,—অনুভবের বিষয়ই হইতে

পারেন না। অনুভব করিতে গেলেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষ হইয়া পড়েন।

"সবিশেষোঽপ্যনুভূয়মানোঽনুভবঃ কেনচিদ্ যুক্ত্যাভ্যাসেন 'নির্ব্বিশেষঃ" ইতি নিষ্কৃষ্যমাণঃ সত্তাতিরেকিভিঃ স্বাসাধারণৈঃ সবিশেষ এবাবতিষ্ঠতে।"

অর্থাৎ অনুভব সবিশেষ বলিয়া অনুভূয়মান হইলেও কোন প্রকার মিথ্যা যুক্তিতে যদি উহাকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাও, তাহার ফলে সত্তার অতিরিক্ত উহার স্বীয় অসাধারণ স্বভাব দ্বারাই বিশেষিত করিলে ঐ অনুভবত্বের ধারণার আর অন্য উপায় পাইবে না। সুতরাং অনুভব সবিশেষত্বের হস্ত হইতে কিছুতেই বিমুক্ত হইতে পাবে না। এই অবস্থায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব মানিয়া লওয়া একেবারেই সর্ব্ব-প্রমাণের অগ্রাহ্য।

ভজনের কথা দূরে থাকুক, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অস্তিত্বাবধারণই অসম্ভব। শ্রীভাষ্যকার এইরূপ বহুল শাস্ত্রতর্কযুক্তিবলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিয়াছেন। অশেষকল্যাণগুণময় ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তিকেই সেই ব্রহ্মলাভের উপায় রূপে বিনির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু সে ভক্তিও জ্ঞানস্বরূপ। শ্রীসম্প্রদায়ের পরমহংসগণ জ্ঞানমিশ্র ভক্তি অবলম্বনেই শ্রীভগবানের সাধনা করিয়া থাকেন।

কিন্তু আমরা ভজন বলিয়া যাহা বলিতেছি, তাহা এতাদৃশ উপাসনা হইতে স্বতন্ত্র এবং সেই ভজনের যিনি বিষয়,

তিনিও এতাদৃশ অশেষ কল্যাণগুণময় সবিশেষ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্।

প্রকৃত ভজনের কথা বলিতে হইলে ব্রজগোপীগণের ভজনের কথাই বলিতে হয়। শ্রীনারদ, ভক্তিসূত্রে বলিয়াছেন—

"অথ ব্রজগোপিকানাম্"

রাগাত্মিকা ব্রজগোপীদের প্রদর্শিত ভক্তির প্রণালীই প্রকৃত ভজন।

রূপ লাগি আঁখি ঝোরে গুণ মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
আকুল পরাণ মোর থির নাহি বান্ধে॥

এই ভক্তিই প্রকৃত ভজন—ইহাই হইতেছে—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষিকেন হৃষিকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

কোন প্রকার উপাধি থাকিতে এ ভজন সম্ভবপর হয় না। মোক্ষবাঞ্ছা ইহায় প্রতিকূল।

"তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান"

সুতরাং ব্রজবধূগণের ভজন প্রণালীই প্রকৃত ভজনপ্রণালী, তাঁহাদের উপাস্য সচ্চিদানন্দ-ঘন রসরাজমূর্ত্তিই উপাস্য। এই সচ্চিদানন্দঘন রসিকশেখরের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-রসে নিরন্তর পরমানন্দে নিমগ্ন থাকাই—ভজন।

প্রসাদ—কণিকামাত্র।

১

দিয়েছ বিবিধ সুখ হরি দয়াময়,
সে তো তোমারি প্রসাদ !
আমার সাথের সাথী, সতত রয়েছে সাথে
বিমল বিষাদ।
দিবানিশি যারে পাই, তারে যে ছাড়িতে নাই,
প্রণয়ে বেঁধেছি মন তাহার চরণে ;
কত আসে কত যায়, সে তো না ছাড়িতে চায় ;
সে না ছাড়ে, তারে বল ছাড়িব কেমনে ?
সর্ব্বত্র হরষ হাসি— মহাপ্রসাদের রাশি—
বিতরিছ জগন্নাথ জগত মাঝারে ;
তোমারি কৃপার পাত্র, প্রসাদ-কণিকা মাত্র
পেলেই যথেষ্ট মানি আমি এ সংসারে।
বেশী সুখে কাজ নাই, পাছে তোমা ভুলে যাই ;
সুখের কণিকা মাত্র—করিব গ্রহণ
বজর-বেদনা বুকে*, তা লয়েও আছি সুখে ;
দিবানিশি মনে পড়ে তোমার চরণ।

শ্রীকালীদাসী দেবী।

---

* একমাত্র অগ্রজের মৃত্যুর অনেক দিন পরে লিখিত।

সেবা-নিষ্ঠা

চৌষট্টি অঙ্গ এভজনের মধ্যে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের—অর্চ্চনা একতম। ভগবৎসাধনের বহু অঙ্গ বৈষ্ণব শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা অবশ্যই বড় সুবিধার কথা। কেন না প্রাথমিক সাধকের চিত্ত এক ভাবে অনেকক্ষণ ভজন-সাধনে তিষ্ঠিতে পারে না। ভজনার অঙ্গ বহু হইলে সে অসুবিধা থাকে না। মানুষের চিত্ত অতি দুর্ব্বল, এক বিষয়ে দীর্ঘকাল চিত্তবৃত্তি ব্যাপৃত রাখিলে চিত্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। একপ্রকার আহার দ্বারা যেমন অরুচির আশঙ্কা হয়, অভক্তকে ভজন পথে আনিতে হইলে এক প্রকার সাধনায় তাহার চিত্তকে অধিকক্ষণ ব্যাপৃত রাখা সম্ভবপর নয়। এই নিমিত্তও চতুঃষষ্টি অঙ্গ ভজনের প্রবর্ত্তন সুবিধাজনক বটে। কিন্তু আমাদের এই যুক্তি বহিরঙ্গা। ভক্ত যখন ভজন রাজ্যে প্রবেশ করেন, তখন নানাভাবে ভগবদ্ভজন তাঁহার চিত্তবৃত্তির পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। তিনি সমস্ত চিত্তবৃত্তি ও সর্ব্বপ্রকার বাসনা ভগবদ্ভজনে ব্যাপৃত রাখিয়া তৃপ্তি লাভ করেন, বহির্ম্মুখ বৃত্তিগুলি ভজন রাজ্যে আনিয়া ভজনেই ব্যাপৃত থাকেন। তাঁহার সকলগুলি বাসনা কেবল ভজনেই চরিতার্থ হয়। যদি কিছু শুনিতে হয়, তবে ভগবানের নাম গুণ রূপ ও লীলাদি-শ্রবণেই তাঁহার শুনিবার ইচ্ছা তৃপ্তি লাভ করে, যদি কিছু দেখিবার ইচ্ছা হয় ভগবদ্‌গুণময় গ্রন্থ, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি, তাহার

লীলাবিহারের স্থল, তাঁহার পরমপ্রিয় ভক্তজনগণ প্রভৃতির সন্দর্শনে তাঁহার নেত্র চরিতার্থ হয়।

এইরূপে বহু অঙ্গে তাঁহার ভজন-কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। শ্রীপাদ শ্রীরূপের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন :—

এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ॥

নিষ্ঠাবান্ সরল ভজনশীল সাধু ভক্ত জগতের এক অনির্ব্বচনীয় অমৃত। এ সকল কথা তুলিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে আমাদের শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর কথা মনে পড়ে; যেমন বৈরাগ্য তেমনই প্রেমভক্তি! ইন্দ্রিয় লালসাশীল জীবের পক্ষে বৈষ্ণবতার ভানও বিড়ম্বনা। কোথায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সম্প্রদায়, আর কোথায় বা বর্ত্তমান বঙ্গীয় বৈষ্ণবসমাজ! গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় পুরামাত্রায় ভণ্ডামি আরও যে কতকাল চলিবে বলা যায় না। আমাদের মত দুর্ভাগ্য জীব এ জগতে থাকিতে বোধ হয় এ দুঃখের অবসান হইবে না।

বৈষ্ণবের সেবা-নিষ্ঠা সন্দর্শন করাও মহাভাগ্য। আমার এক ভক্তিভাজন সুহৃদ ছিলেন, তিনি বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের শ্রীপট-বিগ্রহের অর্চ্চন করিতেন, মালা জপ করিতেন, কীর্ত্তন শুনিতে ভাল বাসিতেন, কিন্তু নিজে কীর্ত্তন করিতে জানিতেন না!

একদিন তাঁহার অসুখের কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে দেখিতে

যাই। শুনিলাম, তাঁহার অসুখ গুরুতর, ভীষণ শূলব্যথা, একশত পাঁচ ডিগ্রী জ্বর। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি, তিনি তাঁহার ঠাকুর ঘরে বসিয়া সেবা করিতেছেন, ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে সচন্দন তুলসী অর্পণ করিতেছেন, ফলাদি নিবেদন করিতেছেন, এইরূপে তাঁহার পূজা ও জপ শেষ হইলে। তিনি তৎক্ষণাৎ আবার শয্যায় শয়ন করিলেন, এক মুহূর্ত্তও বসিতে পারিলেন না।

আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম জ্বর পাঁচ ডিগ্রীরও উপরে। তাঁহাকে বলিলাম, অসুস্থতায় শয্যা হইতে উঠা ভাল নহে। বিশেষতঃ আপনার হৃৎপিণ্ডের অবস্থা ভাল নয়। প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন, "উঠিতে কি পারি? উঠা অসম্ভব। তবে কথাটী কি নিত্যকর্ম্ম বাধ দেওয়া আরও ক্লেশজনক, একেত রোগের ক্লেশ, তাহার উপরে আবার মনে ঐ এক দুঃখ যে আজ নিত্য কর্ম্মটুকু পর্য্যন্ত করা হইল না। ইহার উপরে আরও একটা কথা আছে"—এই বলিয়া তিনি চুপে চুপে আমার কাণের কাছে মুখ রাখিয়া বলিলেন, "আর একটী কথা এই যে আমার প্রাণ-বল্লভের সেবা আমি নিজে না করিলে আমার কিছুতেই তৃপ্তি নাই। আমি উহার শ্রীপাদপদ্মে তুলসী না দিয়া, উহার শ্রীঅঙ্গে একটি ফুল না দিয়া, উহার সম্মুখে একটুকু ফল বা মিষ্টি না দিয়া স্থির থাকিতে পারি না। মনে হয়, আজ বুঝি আমার প্রাণধন অযত্নে রহিলেন, আজ তাঁহার সেবা হইল না, তিনি উপবাসী রহিলেন। আমি তাই নিজেদের সুখ-দুঃখ ত্যাগ করিয়া

মরিতে বসিয়াও তাঁহার সেবা না করিয়া থাকিতে পারি, না। দুঃখ এই যে,—পীড়িত শরীরে সে সাধে বড়ই বাদ পড়ে।

আমি বুঝিলাম ইহাই সেবা-নিষ্ঠা। "নিজ দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি" প্রকৃত সাধক এই মহাবাক্য বুঝিয়া সেবা-নিষ্ঠায় কালাতিবাহিত করেন। দেশ হইতে ঋষিচর্য্যা উঠিয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব ঋষির. বিমল চরিত্র চিন্তা করিলেও হৃদয় পবিত্র হয়।

তুমি ও আমি

কে তুমি,—কে আমি পণ্ডিতেরা ইহা লইয়া চিরদিন কত কথাই বলিতেছেন। আরও কত কাল এই গুহ্য কথা লইয়া কত আলোচনা করিবেন, তথাপি তর্কে ইহার সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন না। তর্কের উপজীব্য প্রমাণ,—প্রত্যক্ষ অনুমান, উপমান ও শব্দ। কিন্তু এই সকল প্রমাণ্যমূলক তর্ক দ্বারা তোমার তত্ত্ব কস্মিন্ কালেও পরিস্ফুট হয় নাই, কখনও হইবে না—হইবারও নহে।

কিন্তু আমি তোমায় জানি, তুমিও আমায় জান। গভীর নিশীথে যখন সকল জগৎ ঘুমাইয়া যায়, নিশীথকালে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘের অন্তরালে মধ্য দিয়া চাঁদের জোছনা লুকাইয়া লুকাইয়া, আত্মপ্রকাশ করে, তখন হে জ্যোতির্ম্ময়, তোমার কথা আমার

মনে পড়ে, তোমার সেই লুকান হাসি, সেই বিজন খেলা—সেই নিত্য মধুময়ী আনন্দলীলা ভাবিতে ভাবিতে আমি আমাকে ভুলিয়া যাই, তোমাতে ও আমাতে যে কি ভেদ আছে তাহা বুঝিতে পারি না ; কি যে অভেদ আছে, তাহাও চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারি না। দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও ভেদাভেদবাদ সকলই এক অচিন্ত্যবাদে ডুবিয়া পড়ে। বিচার বিতর্ক নিরস্ত হয় ; দার্শনিক চিন্তার ভিন্ন ভিন্ন ধারা আমার প্রতীতির মহাধারায় ভাসিয়া যায়।

ইহা তোমারই বিশাল প্রভাব ও অতুল অচিন্ত্য গৌরব ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি আমার অনুভূতির যে গৌরব করি, তাহাও তোমার। এক দিক্ দিয়া দেখিলে ইহা আমার বলিয়া মনে হয়, অপর দিক দিয়া দেখিলে উহাতে তুমি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না।

দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর রসে তোমার উপাসনা হয়। যাঁহারা যে রসে তোমার উপসনা করেন, তাঁহারা সেই রসের আশ্রয় ;—আর তুমি সেই রসের বিষয়। কিন্তু রস এক ব্যতীত দুই নহে। সুতরাং আশ্রয়েও তুমি, বিষয়েও তুমি।—ভেদাভেদ অচিন্ত্য। তাই তুমি গৌরলীলায় বুঝাইয়া দিয়াছ, কেবলাদ্বৈতবাদাচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যা যেমন এক দেশীয়, দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদও তথাবিধ। শ্রুতির সমগ্র বাদ লইয়াই শ্রীগৌর-সিদ্ধান্তের পূর্ণতা; তাহাতেই উহার সর্ব্বাঙ্গিক সৌন্দর্য্য ; তাহাতেই উহার সার্ব্বভৌমিকতা।

কিন্তু তোমাকে জানিতে হইলে আরও কিছু চাই। কেবল অনুভূতি বা সংবিদ্ লইয়া আমি তোমায় বুঝিতে পারি না। তুমি লীলারসময়— তাই না তুমি ও আমি! নচেৎ সবই তুমি।

তোমার লীলারস বুঝিতে হইলে আরও কিছু চাই—রসিকেন্দ্র চূড়ামণি—রসে রসে তোমায় ধরিতে না পারিলে, তোমাকে জানিতে পাই না, আমাকেও আমি চিনিতে পারি না। কে আমি জানিতে হইলে—সর্ব্বাগ্রে কে তুমি তাহা জানিতে হয়। তোমাকে জানা হইলে আমাকে জানা। আমি যখন আমার ভিতর দিয়া তোমাকে জানিতে চাই—তখন আত্মপ্রত্যয়ের কথা তুলি,—স্বানুভূতি বা স্বানুভাবের বিচার করি, আত্মতত্ত্বেরও এক শুষ্ক মরুতে ছলনাময়ী এক মরীচিকা আমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া আমায় বিড়ম্বিত করে।

কিন্তু হে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য রসের অনন্ত অফুরন্ত অসীম অপার অমেয় সমুদ্র—যখন তোমার মধ্য দিয়া আমি আমার অনুসন্ধান করি, তখন আনন্দ রস-সমুদ্রের তরঙ্গ-তরঙ্গে আমার সমগ্র অনু-সন্ধিৎসা চরিতার্থ হয়—তখন তোমাতে ও আমাতে যে নিত্য মধুর রসপূর্ণ সম্বন্ধ বিদ্যমান তাহা অনুভব করিয়া কৃতার্থ হই—ভেদাভেদ ভুলিয়া যাই—নিখিল বিশ্ব-সংসার ভুলিয়া তোমাতেই ভুলিয়া যাই। ভক্ত সাধক ও সিদ্ধ ভক্তের ইহাই চূড়ান্ত সাক্ষ্য। এ সাক্ষ্যের তুলনা নাই। তাই তোমায় আমি সত্য বলিয়া শিব বলিয়া ও সুন্দর বলিয়া চিনিয়াছি! হে আমার চির-সত্য চির-মঙ্গল ও চির-সুন্দর আমি তোমার—তুমিও আমার।

এইরূপ অনেক কথা মনে জাগে, কিন্তু সকল কথা ভাষায় ফোটে না। হৃদয়ের রাজা, তুমি হৃদয়ে যে আনন্দ দাও, তাহা ভাষায় প্রকাশ পায় না। আমি তোমায় জানিতে চাই, ধরিতে চাই, কিন্তু তোমার ও আমার মধ্যে কি একটা ব্যবধান আছে, তাহা তোমাকে দেখিতে দেয় না, তোমায় ভাবিতে দেয় না, তোমায় ধরিতে দেয় না। ইহাকে কেহ বলে মায়া, কেহ বলে অজ্ঞান, আর কেহ বলে অবিদ্যা। কিন্তু আমি ইহার কিছুই বুঝি না।

আমার মনে হয়—সকলই তোমার ইচ্ছা। মায়া, অজ্ঞান ও অবিদ্যা—এই সকল তোমারই ইচ্ছার নামান্তর। লীলাময় তুমি—তুমি তোমার প্রিয় সখাকে একদিন বলিয়াছিলে আমি যোগমায়ার অন্তরালে লুকাইয়া থাকি, সকলকে দেখা দি না।

কেন দেখা দাও না?—তুমি দেখা না দিলে কে তোমায় দেখিতে পায়? তুমি যদি আত্মগোপন কর, ব্রহ্মাও চিরকাল অনুসন্ধান করিয়া তোমায় দেখিতে পান না। এমন কি রাস-লীলায় তুমি যখন অন্তর্হিত হইলে, তখন তোমার প্রেয়সীরাও তো তোমায় খুঁজিয়া পান নাই। তোমার এ লীলারহস্য ভেদ করা জীবের সাধ্যাতীত। যাঁহারা সাধন করেন, ভজন করেন, তুমি তাহাদের দুষ্প্রেক্ষ্য, তবে আর আমার আশা কি?

আমি সারা রজনী অলস ভাবে জাগিয়া পোহাই, কত দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা হৃদয়ে লইয়া রাত্রি প্রভাত করি। বিষয়ের কোলাহলে জাগিয়া উঠি, অকর্মে বিকর্মে দিবা অতিবাহিত হয়—কিন্তু তোমার

তো মনে করি না—তথাপি দয়াময় তুমি কৃপা করিয়া আমায় বজ্র বেদনায় ও গভীর নিরাশায় তোমায় অভিমুখ করিয়া তোল।

যাহারা কর্ম্মবাদ মানে, তাহারা আপন কর্ম্মফল মনে করিয়া দুঃখ ক্লেশের সময়ে তোমায় স্মরণ করে, সৎকর্ম্ম করিতে প্রয়াস পায়, কিন্তু আমি কর্ম্মফল বুঝি না—আমি ভাবি তুমিই একমাত্র কর্ত্তা—ভাল করি আর মন্দ করি—সকলি তুমিই করাও। তুমি এক অদ্বিতীয় সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বশক্তিমান্,—পরমাণু হইতে হিমালয় তোমার নিয়মে নিয়মিত, অনন্ত জীবের অনন্ত অন্তরাত্মায় এক তুমিই অধিষ্ঠিত। তোমাকে জানিলেই সকল জানা হয়। এই তো খাটি সিদ্ধান্ত। হে অন্তরের অন্তরতম, তোমার ইচ্ছাতেই আমি, তোমাতেই আমি, তোমা হইতে আমি, তোমার দ্বারাই আমি, তোমারই আমি, সুতরাং তুমিই আমি।

আমি আমাকে বুঝি না, আমার কর্ম্ম বুঝি না—আমি তোমাকে বুঝি, তোমার কর্ম্মই বুঝি, আমি কিছুই করি না—সকলই তুমি কর। আমার সুখের নিয়ন্তা তুমি, দুঃখের নিয়ন্তাও তুমি। পাপের নিয়ন্তা তুমি—পুণ্যের নিয়ন্তাও তুমি—তোমায় যখন ভুলি, তুমিই আমায় ভুলাও, আবার তোমায় যখন স্মরি, তুমি আপনি তোমার এই ক্ষুদ্র কুটীরে আসিয়া রাজার বেশে হৃদয় অধিকার কর।

তোমার মত আপন আমার আর কেহ নাই, আমি ইহা বুঝিয়াছি। সুখে দুঃখে তুমিই আমার একমাত্র অবলম্বন। দেখিতেছি, তুমিই আমার ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণার জল, শীতের বসন,

শোভায় ভূষণ। তুমিই নিশীথে আমার আঁধার ঘরের আলোক। যদি এজগতে খাটি কিছু বুঝিয়া থাকি, তবে ইহাই বুঝিয়াছি।

কিন্তু জীবনের কাজ এ বুঝার সহিত মিলে নাই, মিলাইতে পারি নাই, তাদৃশ চেষ্টা করার সুবিধাও পাই নাই। আমি যে আমার চেষ্টা বলি, তাহাও ভ্রম। তুমি আমায় সত্যের পথে, পবিত্রতার পথে ভক্তির পথে তোমার দিকে লইয়া যাও—তোমার শ্রীচরণে ইহাই প্রার্থনা।

আমার মন্দির

অনেক দিন ধরিয়া বাহিরে বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছি, শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারি নাই। আমার মন্দিরের ঠাকুর দয়াময়—মন্দিরের দ্বার অবারিত। বাহিরে ভীষণ তাপ; সেখানে প্রবেশ করিলেই শীতলতার অনুভব। মনে হয় এমন স্নিগ্ধ শীতল সুস্থান বুঝি আর কোথাও নাই। আমার বাহিরে প্রলয়ঙ্কর তুফান —সে ঝড়ে বুঝি পাহাড়ও টলিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু আমার মন্দিরে তখনও সুখময় নিস্তব্ধ শান্তি। ইন্দ্রের কোপে ব্রজধামে যখন খণ্ড-প্রলয় উপস্থিত হইল, ভক্তরক্ষক গিরিধারী তখন গোবর্দ্ধন উত্তোলন করিলেন—ব্রজবাসিগণ তখন গিরিধারীর গিরিমন্দিরের আশ্রয় লইয়া সাত দিন সাতরাত পরম সুখশান্তিতে অতিবাহিত করিলেন—দেশের উপর দিয়া এতবড় একটা প্রলয়

তুফান চলিয়া গেল, তাঁহারা তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। আমি এ লীলা সত্য সত্যই বিশ্বাস করি—অনুভব করি—প্রত্যক্ষ করি—বাস্তবিক এমনই আমার শ্রীমন্দির।

যখন সমুদ্রগর্জ্জনে বিপদের প্রলয়ঙ্কর তুফান তরঙ্গে তরঙ্গে আমার জীবনের তটভূমি আক্রমণ করে, আমি তখন ফুল্ল মনে আমার মন্দিরে প্রবেশ করি। এ জগন্নাথ-মন্দিরে সমুদ্রগর্জ্জন শুনিতে পাওয় যায় না। বিপদের তরঙ্গাভিঘাত অনিবার্য্য কিন্তু উহা হইতে আত্মরক্ষা করা চাই—তাহা পুরুষের ন্যায় করিতে হইবে। পশ্চাৎ দিকে পলায়ন ও দুর্গাশ্রয় সময়ে সময়ে বীর-কুশলতারই পরিচায়ক—বীর-নীতিরই সুবিচারিত প্রণালী—উহা কাপুরুষতা নহে। তাই আমিও সময়ে সময়ে আমার সুখশান্তিময় অভেদ্য দুর্গে প্রবেশ করিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করি এবং সেখান হইতে বলসঞ্চয় করি। আমার শ্রীমন্দিরই আমার দুর্গ। আমার গিরিধারী গোবিন্দ গোপাল এ মন্দিরের অধিষ্ঠাতৃদেব। শ্রীমন্দির নিরাপদ, দ্বারও অবারিত। বিপদ তো পদে পদেই ভয়ানক হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তথাপি সর্ব্বদা শ্রীমন্দিরে প্রবেশের প্রবৃত্তি হয় না—প্রবেশ করি না—কাজেই বিপদ্ ভোগ করি। এ আলস্য-পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রতিনিয়তই ভোগ করিতে হয়। শয্যার উপরে মশারি কুঞ্চিত রহিয়াছে, অথচ শয়ান ব্যক্তি আলস্য বশতঃ কুঞ্চিত মশারি বিস্তৃত না করিয়া সারানিশি মশক-দংশনে ক্লেশ ভোগ করে—এমনই কর্ম্মবিপাক! আমার অবস্থাও সেইরূপ—এমন সুরম্য, সুশান্ত, সুস্নিগ্ধ শ্রীমন্দির আমার সমক্ষে

নিত্য বর্ত্তমান—তথাপি আমি বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া ফিরিয়া ত্রিতাপের অনল জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি—কি কর্ম্মভোগ !

বিপদের বজ্র অনবরতই আন্দোলিত হইতেছে অথচ অমার্জ্জনীয় আলস্যে মন্দিরের বাহিরে ভীত ভীত ভাবে বিচরণ করিতেছি—এই যে অবিবেচনা, অপরিণামদর্শিতা—ইহারই অপর নাম মোহ।

চিত্তের এই জড়তাই সর্ব্ববিঘ্নের আকর। মানুষ বিপদের যত ভয় করে, বিপদ হইতে আত্মরক্ষার জন্য তত সচেষ্ট হয় না। আমার মত মোহস্তব্ধ ব্যক্তিদের ইহাই দুর্গতির হেতু।

গিরিধারী গিরি উত্তোলন করিয়া জীবের নিরাপদ আশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন, সুচতুর ভক্তগণ বিপৎপাতের আশঙ্কা দেখিয়া তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করেন কিন্তু বহিঃপ্রিয় বহিরঙ্গগণ উহার সন্ধান রাখেন না। সন্ধান পাইলেও উহাতে প্রবেশ-প্রয়াসী হন না। আমরা আপন আপন জীবনে ইহার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়াছি। শ্রীভাগবতের একটী শ্লোক সর্ব্বদাই মনে পড়ে—

> ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
> মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা॥

দুঃখ-যাতনায় সুদীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিয়া পরিশ্রান্ত পান্থ যেমন আপনার শান্তিময় নিকেতনে পথের ক্লেশ ভুলিয়া যায়, সেইরূপ সংসার-পথের পরিশ্রান্ত পথিক যখন ভ্রমিতে ভ্রমিতে শ্রীকৃষ্ণপদমূল আশ্রয় করেন, তখন তাহাতেই পরমা শান্তি লাভ করিয়া আর তাহা ত্যাগ করেন না। চিত্ত যখন শ্রীকৃষ্ণপদ-চিন্তায় আবিষ্ট হয়,

সংসারের তাপে, ঝড় তুফানে বা ঝঞ্ঝাবাতে উহাকে উত্যক্ত ও যাতনাগ্রস্ত করিতে পারে না। বিষয়-বিনিবৃত্ত চিত্তের শ্রীকৃষ্ণপদ-ভাবনায় যে আনন্দ, সেরূপ আনন্দের তুলনা নাই। এমন সুখশান্তিময় আনন্দ আর কিছুতেই নাই। এখানেই আমার শ্রীগিরিধারী গোপালের শ্রীমন্দির। এই সুখশান্তিময় প্রেমভক্তি-রসময় শ্রীমন্দিরই সংসার-তাপদগ্ধ জীবের পরম আশ্রয়।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী

১

নিবীড় মেঘ- মেদুর বিশ্ব
গগনে গরজে ঘোর,
চমকে চপলা বাড়ায় আঁধার
আঁধারের নাই ওর।

২

বরষে বাদল ঝর ঝর ঝর
প্লাবিত মেদিনী জলে;
উথলি উঠিল তরঙ্গ-রঙ্গ
শ্যামল যমুনা জলে।

৩

গভীর নিশীথ বন আঁধিয়ারা
আঁধারের মাঝে হাসি—

হাসির লহরে চমকে চপলা
মেঘের কোলেতে ভাসি!

৪

আঁধারে আবরি ধরণী বক্ষ
কারার কক্ষ মাঝে
এলো কালাচাঁদ করিতে মুক্ত
মানবে মানব-সাজে।

৫

কোটি কোটি ভানু কিরণ উজ্জল
প্রভায় প্রদীপ্ত কায়
শ্যাম কলেবর প্রেমল সুন্দর
শিব ব্রহ্মা লুটে পায়।

৬

ধন্য ধরণী জীব-জননী
চরণ-পরশ পেয়ে।
আনন্দে ভাসিল বিশাল বিশ্ব
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল গেয়ে॥

৭

এ হেন নিশায় অলস শয্যায়
যে জন ঘুমায়ে রয়,
শ্রীকৃষ্ণ-জনম লীলা অস্বাদনে
সে জন বঞ্চিত হয়।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।

শেষের সে দিন

জন্মিলেই মরিতে হইবে ইহা নিশ্চয়। কিন্তু মরণের জন্ম প্রস্তুত হওয়ার প্রয়াস সকলের হয় না। যিনি ধনী তিনি মরণের লক্ষণ নিকটবর্ত্তী হইলে, বিষয়ব্যাপারের বন্দোবস্ত করেন এরূপ ব্যাপার সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু দেহাতিরিক্ত যে পৃথক্ আত্মা আছেন, এ বিশ্বাস যাঁহাদের আছে, তাঁহারা তাঁহাদের আত্মার সম্বন্ধেও কিছু চিন্তা করেন। জীব অন্তকালে কি গতি লাভ করিবে, কোথায় কি প্রকারে আবার নবজীবন আরম্ভ করিবে, এ চিন্তাও তাঁহাদের চিত্তে উদিত হয় এবং তজ্জন্যও তাঁহারা কিঞ্চিৎ বন্দোবস্ত করিতে প্রায়স পান।

কিন্তু আত্মার কথা ভাবিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি-সামর্থ্য অতি অল্প লোকেরই আছে। স্থূলদর্শী মনুষ্য স্থূল জ্ঞানেই বিমূঢ় থাকে। পার্থিব বিষয়াসক্ত চিত্ত মরণের মুহূর্ত্তেও পার্থিব বিষয়-ব্যাপারের চিন্তাই করিয়া থাকে—চিত্ত হইতে এখানকার সংস্কার উড়াইয়া দিতে সমর্থ হয় না। জন্মে জন্মে যে সকল সংস্কার চিত্ত-ক্ষেত্র অধিকার করিয়া রহিয়াছে, সে সকল সংস্কার মুছিয়া ফেলিয়া চিত্তকে পরিস্কৃত করা অল্পায়াসসাধ্য নহে। এ নিমিত্ত বৈরাগ্য অভ্যাসাপেক্ষা জীবনের প্রথম হইতে ত্যাগাভ্যাস শিক্ষা না করিলে অন্তিম দিনে কোনও ক্রমেই চিত্তকে নির্ব্বিষয় করা যায় না। বিষয়ী লোকের মৃত্যুর পরে তাহার প্রিয়জনগণ তাঁহার প্রতি

তাহাদের শ্রদ্ধাসূচক অনেক কথা বলিয়া তাঁহার অন্তিম মুহূর্ত্তের উচ্চতম ভাবের প্রখ্যাপন করেন, ইহা স্বাভাবিক এবং অবশিষ্ট মনুষ্যবর্গের পক্ষে ইহার ফলও শুভপ্রদ। কেন না অপরাপর ব্যক্তি-রাও সেইরূপে দেহত্যাগ করা,—প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সত্য সর্ব্বাপেক্ষা আদরের ধন। চিত্তকে পার্থিব বিষয়-ব্যাপার হইতে বিমুক্ত রাখিতে হইলে যে প্রকার সাধনার প্রয়োজন দেহত্যাগের বহু পূর্ব্ব হইতে তাহার অভ্যাস রাখা আবশ্যক। বাসনাত্যাগের প্রয়াস এক কঠোর সাধনা। কঠোর তপস্যাতেও এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া দুষ্কর। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এ সম্বন্ধে বহুল সদুপদেশ আছে,—সেই সকল উপনিষদ্বাক্য জ্ঞানী লোক দ্বারা পঠিত হয়। সংসারাসক্ত-চিত্ত ব্যক্তিরাও উহা পাঠ করেন। কিন্তু কেবল পাঠে যদি ফল লাভ হইত, তবে মুখে মধু মধু বলিলেও তাহার আস্বাদন-সুখ অনুভূত হইত। উপদেশ বাক্য গুলি চিত্তের সমক্ষে ক্রিয়াশীল সজীব মূর্ত্তির ন্যায় প্রতিফলিত না হইলে চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখিতে পারে না। বিড়ালের শব্দ কর্ণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করিলেই মূষিক পলায়ন করে, ময়ূরের ধ্বনি শুনিলেই সর্প সরিয়া পড়ে। ভয়ের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি তাহাদের চিত্তপটে অঙ্কিত হয় বলিয়াই উহারা সাবধান হয়। মানবহৃদয়েও উপদেশ-বাণীর সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি নিরন্তর বিরাজমানা না হইলে, কেবল পঠনে উহার ফললাভ হয় না। ঘুমন্ত দেবতাকে জাগ্রত করিয়া তোলা চাই, মৃণ্ময়ীর প্রতিষ্ঠা করিয়া চিন্ময়ী করিয়া লইয়া উহার উপসনা করিতে হয়।

এ সাধনার একমাত্র উপায় ভগবদ্ভক্তি। ভক্তিযোগে সাধনার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়—ভক্তি যোগেই বৈরাগ্য ও অহৈতুক জ্ঞানের উদয় হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের উপেশ এই—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥

ভক্তিযোগের ফলে বাসনা-ত্যাগ সম্ভবপর হয়; নচেৎ উহার অন্য কোনও উপায় নাই। পার্থিব বিষয়, ভক্তিহীন চিত্তকে কোন প্রকারেই ছাড়িতে চায় না। কিন্তু চিত্ত যদি আনন্দ রসবিগ্রহের মধুর মূর্ত্তি, মধুর নাম এবং সর্ব্বচিত্তাকর্ষণী লীলা-কথা দ্বারা অধিকৃত হয়, তবে পার্থিব বিষয়-সংস্কার সে হৃদয়ে প্রবেশের পথ পায় না। সুতরাং বাসনা-ত্যাগ-নিবন্ধন বৈরাগ্য উপজাত হয় এবং উহা ভগবদ্ভাবনিষেবণের অনুকুল হয়। কেবল বিষয়-বাসনা পরিত্যাগের কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। পার্থিব বিষয়-সম্ভোগ-বাসনা সমূহকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া যদি হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি সুপ্রতিষ্টিত হয়, এবং তাঁহার নাম-গুণ-রূপ-লীলাদি স্মরণ করিতে করিতে, কীর্ত্তন করিতে করিতে, মনন করিতে করিতে ও ধ্যান করিতে আত্মা দেহত্যাগ করিতে পারেন, তবেই শেষের সে দিনের সুব্যবস্থা হয়। তাঁহার কৃপাই এ সম্বন্ধে জীবের প্রধান সম্বল। তথাপি সাধনা চাই।

মরণ-বঁধুয়া

এস এস এস　　　সমীপে আমার
আমার মরণ বঁধুয়া !
আকুল পরাণে　　　জাগি সারা নিশি
তোমার দরশ লাগিয়া।
তুমিই ঘুচাও ভবের ভ্রান্তি,
তুমি আনি দাও চরমা শান্তি,
তুমি যে আমার কোমল কান্তি,
আঁধার পথের সাথিয়া।
তোমার কোলেতে　　　মাথাটী রাখিয়া
ভুলিব সকল জ্বালা ;
মায়ের কোলেতে　　　ঘুমায় যেমতি
শৈশবে কোমল বালা।
উজ্বালি বাতি　　　সারাটী রাতি
তোমারে ধেয়াই মনে ;
তুমিই আমার　　　শ্যাম বা শ্যামা
স্বরগে, সংসারে, বনে :
এস এস এস　　　বঁধুয়া আমার
আশার উজ্জল আলো,—
সকলের আছে　　　সকলি হেথায়
তুমিই আমার ভালো।

শ্রীকালীদাসী দেবী

শূন্য কানন

আজ শূন্য কানন সম্মুখে লইয়া বিষণ্ণভাবে বসিয়া রহিয়াছি। শ্রীভগবানের অর্চ্চনার জন্য যে হৃদয় কাননে শত শত প্রকার ফুল ফুটিত, ফুল তুলিতে তুলিতে ফুলের সাজি পূর্ণ হইত, কিন্তু ফুল ফুরাইত না, আজ সেখানে একটিও ফুল নাই, তুলসী পর্য্যন্ত পত্রহীন হইয়াছেন, সবুজ পাতার চিহ্নমাত্র নাই—সাধের কানন শুকাইয়া গিয়াছে, আমার প্রাণের দেবতা, আজ তোমার চরণে দিবার কিছুই নাই। আজ কি দিয়া তোমার পূজা করিব ”

বসন্তবাহার চলিয়া গিয়াছে, আজ ঘোরতর নিদাঘ—মর্ম্মদাহী মার্ত্তণ্ডপ্রতাপ—সর্ব্বগ্রাসী ভীষণ সন্তাপ! রসের শেষবিন্দুটুকুও উড়িয়া গিয়াছে। রসরাজ, এমন মরুভূমে বসিয়া কেমন করিয়া তোমায় ডাকিব, কোন্ প্রাণে তোমার পূজার আয়োজন করিব?

কেন এমন হইল, বুঝিতে পারি। অপরাধ হইয়াছে, নিশ্চয়—প্রতিমূহূর্ত্তেই অপরাধ হইতেছে—ইহাও ধ্রুব। বদ্ধজীবের দুশ্চিন্তাতেই হৃদয়ে এ আগুন জলে, হৃদয় পুরিয়া ছারখার হয়, মরুভূমিতে পরিণত হয়—ইহা নিশ্চয়। তুমি রসময়, অখিল-রসামৃত মূর্ত্তি;—তোমাতে চিত্ত রাখিতে পারিলে এ জ্বালা ঘটে না, এদুর্দ্দশা হয় না, তাহাও বুঝিতে পারি।

কিন্তু কার্য্যতঃ চিত্ত তোমা হইতে দূরে দূরে থাকে—থাকিতে যে ভালবাসে তাহা নয়, তথাপি থাকে—থাকিয়া থাকিয়া

শুষ্ক হয়, পুড়িয়া পুড়িয়া দগ্ধ হয়, তখন আবার তোমাকেই চায়—কিন্তু হায়, তখন তুমি কোথায়,—ঘোর নিদাঘে আমার নব-জলধর কোথায়, আমার নবনীরদরুচি কোথায়, আমার শ্যামসুন্দর কোথায়, আমার সে নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়, আমার সুরেন্দ্রনীল-দ্যুতি কোথায়, আমার তাপিত প্রাণের সুধালহরী কোথায়? আজ এই ভীষণ দুর্দ্দিনে আর তোমার দেখা নাই।

দেখার উপায়তো খুঁজিয়া পাই না। আমার হৃদয়-বৃন্দাবন-বনবিহারি, আজ তুমি অপ্রকট। তুমি আনন্দলীলা-রসবিগ্রহ, এ মরুভূমিতে তোমার পাওয়ার আশা নাই। শ্যামল যমুনার সে সুধাতরঙ্গ আজ আমি স্বপ্নে ভাবিয়া আনিতে পারি না—সে রসময় বৃন্দাবন আজ আমার স্বপ্নের অতীত। নিদারুণ সংসারদাহ দাবদাহের ন্যায় আমার সাধের কানন পুড়িয়া ছারখার করিয়া দিয়াছে। কেন যে দুশ্চিন্তা, তাহা বুঝিতে পারি না,—যে চিন্তার কুলকিনারা নাই,—যে চিন্তা কেবল দুঃখেরই নিদান—যে চিন্তার ফল কেবল নরকজ্বালা—কেন যে তাহাতে চিত্তবৃত্তি অনলশিখা-সঙ্গলিপ্সু পতঙ্গের ন্যায় অনবরত ধাবিত হয়, জানিয়া শুনিয়া তাহাতে গিয়া পুড়িয়া মরে, তাহার কারণ খুঁজিয়া পাই না।

সংসার-বিষের তীব্র জ্বালায় জানিয়া শুনিয়াও সমাদরে সেই কালসাপকে হৃদয়ে স্থান দেই। তাহার পরিণাম অনিবার্য্য। তাহার উপরে আবার তোমার অভিমান। মর্ম্মে মর্ম্মে যখন পুড়িয়া পুড়িয়া জ্বলিয়া মরি তখন ডাকিয়াও তোমায় পাই না, খুঁজিয়া তোমার সন্ধান মিলে না। যাঁহারা তোমার প্রিয়জন,

তাঁহারা সময়ে সময়ে তোমার বিরহে ব্যথিত হন, ডাকিলে তখনই তুমি দেখা দাও,—দেখা না দিলে তোমাকেই তাহাদের মানের দায়ে পড়িতে হয়,—সাধিয়া সাধিয়া তাঁহাদের মান ভাঙ্গিতে হয়, সে কথা স্বতন্ত্র। যেহেতু তাঁহারা তো তোমাগত প্রাণ—তোমাগত মন। কিন্তু এ অধম অনন্ত বহির্মুখ। সময়ে সময়ে ইহা মনে হয়, যে তুমি যদি কৃপা কর, তবে অন্য কিছুর প্রয়োজন নাই। কিন্তু তাহা সাময়িক। তোমার মধুময়ী শাশ্বতী স্মৃতি, মন্দাকিনী প্রবাহের ন্যায় চিরদিন হৃদয়ে জাগাইয়া না রাখিতে পারিলে হৃদয়ের যে দুর্দ্দশা ঘটে তাহা ভালরূপেই বুঝিতে পারিতেছি।

লোকে কথায় কথায় তোমার কৃপা ভিক্ষা করে—কিন্তু সে সাহস আমার নাই। এ চির-অপরাধীর সে সাহস কোথায়—সে ভরসা কোথায়? কিন্তু তোমার কৃপা নিয়ম মানে না—বিধান মানে না, অযাচিত ভাবে,—অপ্রার্থিতভাবে সে কৃপার সুধাতরঙ্গ সময়ে সময়ে এ মরুকেও পরিষিক্ত করিয়া চলিয়া যায়। সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র। তটভূভাগ মরুময়। বালুকাপুঞ্জের মহাশ্মশানে সৈকত-বালুকা সমুদ্র-তরঙ্গে পরিষিক্ত হয়, কিন্তু দূরস্থকে প্রতি-নিয়তই সে জ্বালমালা ভোগ করিতে হয়।

আজ এ হৃদয়মরু বাসনার কণ্টক-কঙ্করে পরিপূর্ণ। এখানে তোমায় ডাকিতে সাধ হয় না—সাহস হয় না। রসময় রাসেশ্বর নিকুঞ্জবিহারি,—জীবনের এই ঘোর নিদাঘে চারিদিকেই প্রলয়-কালানল দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহাও সার্থক মনে করিব, যদি ইহার ফলে ইতর বাসনাগুলি পুড়িয়া পুড়িয়া

ভস্মীভূত হইয়া যায়—হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইতেছে,—হউক। তারপরে তুমি তোমার কৃপারসে সেই ভস্মস্তূপ পরিষিক্ত করিয়া তাহাতে শ্রীবৃন্দাবনের ভক্তিলতিকার বীজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিও—ইহাই আমার অন্তিম নিবেদন।

সাধনার ধন

হে আমার চির সুন্দর, চির মধুর,—আমি ক্ষুদ্র স্বার্থে তোমায় ভুলিয়া থাকি, কিন্তু দয়াময় তুমি, আপনি আমার হৃদয় দ্বারে আসিয়া দাঁড়াও। তোমার প্রেমের অবধি নাই, দয়ার অবধি নাই। মান ভাঙ্গিতে ও মান বাড়াইতে তুমিই জান। কিন্তু এ অপরাধীর মান করিবার কিছুই নাই। যাহারা তোমার খুঁজিয়া খুঁজিয়া আকুল হয়, অথচ তোমায় পায় না, তুমি তাহাদের সহিত লুকোচুরি খেলিতে ভালবাস। ইহাতে তাহাদের মান হইতেও পারে। যাহারা তোমায় ডাকিয়া ডাকিয়া আকুল হয়, অথচ তোমার সাড়া পায় না তাহারা মান করিয়া নীরব হয় তাহাদের মান স্বাভাবিক।

কিন্তু আমি স্বার্থের দাস—প্রতি মুহূর্ত্তেই স্বার্থবিজড়িত। তোমায় ভাবি না, তোমায় ডাকি না, তোমার স্মরণ পর্য্যন্ত করার প্রবৃত্তিটুকু পর্য্যন্ত আমার নাই, কিন্তু দয়াময় তথাপি তোমার কৃপা আমি অনুভব করিতে পারি। নীল নভঃস্থলে স্ফুটচন্দ্র

তারকায় তুমি তোমার মঙ্গল মধুর জ্যোতি প্রকাশ করিয়া যখন এ অধমের দিকে স্মিত-শুভাননে দৃষ্টিপাত কর, তখন আমি অনিচ্ছাতেও তোমার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। কাননে কাননে কোমল কিশলয়ে তোমারই স্নিগ্ধ মাধুর্য্য সন্দর্শন করিতে পাই। কুসুমে কুসুমে তোমারই সুষমা ফুটিয়া উঠে।

বিহঙ্গের কলতানে, সুকণ্ঠ গায়কের গানে, নরনারী বালক বালিকাদের প্রীতি-সোহাগ বিজড়িত সুকোমল সম্ভাষণে, তোমারই মঙ্গল-মধুর ভাষা প্রকাশ পায়। স্নিগ্ধ সমীর তোমাকেই দেখাইয়া দেয়। প্রতপ্ত প্রখর নিদাঘের দিবাবসানে যখন আমি আমার কুটীরের দ্বারে বিবশ হইয়া পড়িয়া থাকি, তখন তুমিই মৃদুল হিল্লোলে হিল্লোলে মায়ের স্নেহের মত আমার তাপদগ্ধ অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তোমার কৃপার প্রভাব বুঝাইয়া দাও। আমি মহা পাষণ্ড হইলেও তোমায় স্বীকার না করিয়া স্থির থাকিতে পারি না।

এ সকল কথা ভুলিবার নয়। কিন্তু তবু ভুলি, ভুলিয়া ভুলিয়া নিজ স্বার্থে মজিয়া থাকি। তুমি শব্দে স্পর্শে রূপে রসে গন্ধে অনুক্ষণ আত্ম-প্রকাশ করিতেছ। কিন্তু আমি অন্ধ হইয়া তোমার মধুর ধাম দেখিতে পাই না। যাঁহারা বলেন, তুমি ইন্দ্রিয়ের অতীত, তাঁহাদের মত উচ্চ জ্ঞান আমার নাই, তাঁহাদের কথা আমি একেবারেই বুঝিতে পারি না। হইতে পারে, তুমি ইন্দ্রিয়ের অতীত। তুমি নিজে দেখা না দিলে কে তোমায় দেখিতে পারে, নিজে ধরা না দিলে কে তোমায় ধরিতে পারে? নিজে তুমি না জানাইলে কে তোমায় জানিতে পারে?

এ সকল কথা আমি বুঝিতে পারি—এই হিসাবে তুমি ইন্দ্রিয়ের অতীত হইতে পার। কিন্তু তোমার স্বভাব তেমন নয়। তুমি না ডাকিলেও দেখা দেও—না বুঝিলেও হৃদয়ের দ্বারে আসিয়া আত্ম প্রকাশ কর—তুমি ফুলে ফলে লতায় পাতায় সর্ব্বত্রই উজ্জ্বলভাবে আত্ম-প্রকটন করিয়া পাষণ্ডের নিকটেও প্রকাশিত হও। এমনই তোমার দয়া—অথচ ইহাই তোমার স্বভাব।

তোমার স্বরূপ কি,—ইহা লইয়া জ্ঞানি-সমাজ চিরদিনই বাদানুবাদ করিয়া আসিতেছেন। নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেকবিচারে ইন্দ্রিয় পদার্থাবলী তোমার স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। তাঁহাদের কথা এই যে যাহা দৃশ্য তাহা বিনশ্য, যাহা বিনশ্য তাহা অনিত্য—যাহা অনিত্য তাহা তুমি নও। কেন না তুমি নিত্য। তুমি নিত্য একথা সত্য,—কিন্তু যাহা দৃশ্য তাহা কি তোমা ছাড়া? তাহা কি তোমা অতিরিক্ত অন্য পদার্থ? এ কথা আমি একেবারেই বুঝিতে পারি না। আমার এ ধারণা একবারেই নাই যে চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহ নক্ষত্র পরিপূরিত নীলাকাশ তোমাতিরিক্ত পদার্থ; এই নদ-নদী-নগরারণ্যবিশোভিত অশেষভূতধাত্রী ধরিত্রী তোমা হইতে ভিন্ন পদার্থ,—এ দ্বৈতবাদ আমি মনে স্থান দিতে একেবারেই অসমর্থ। আবার অপর পক্ষে ইহাও বুঝিতে পারি না, যে এই সকল দৃশ্য পদার্থ স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা, বা ইন্দ্রজালের ন্যায় অলীক—এ সকল একবারেই কিছুই নয়। দৃশ্যের পরিবর্ত্তন হয় সত্য, কিন্তু প্রত্যেক দৃশ্যের অন্তরালে তুমি নিত্য সত্য বর্ত্তমান,—ইহা তুমিই আমায় বুঝাইয়াছ। তরঙ্গে তরঙ্গে সমুদ্রের আকার

শতধা-সহস্রধা পরিবর্ত্তিত হয় ইহা সত্য; কিন্তু তরঙ্গগুলি তো সমুদ্র ভিন্ন অপর কিছুই নয়।

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মহৎ ক্ষুদ্র স্থূল যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় বা যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না—সংক্ষেপতঃ যাহা প্রত্যক্ষের গোচরীভূত বা প্রত্যক্ষের অতীত - সে সকলই তুমি—তোমারই শক্তির স্ফূর্ত্তি—তোমারই শক্তির মূর্ত্তি। হে জগদাধার, হে জগন্মূর্ত্তি, আমি তোমা-ছাড়া জগৎ চিন্তা করিতে অসমর্থ। প্রলয়ে প্রলয়ে জগৎ যখন প্রলীন হয়, তখন তোমাতেই প্রলীন হয়, আবার যখন উদ্ভূত হয়, শনৈঃ শনৈঃ ক্রমে ক্রমে তোমা হইতেই উদ্ভূত হইয়া বিচিত্র সৌন্দর্য্যে আমার ইন্দ্রিয় সমক্ষে প্রতিভাত হয়, এবং তোমাতেই বিশ্ব অবস্থান করে - তাই বলি "আনন্দাদেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেনৈব জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযান্ত্যভিসংবিশন্তি।"

হে পরমানন্দ, তুমি চিরপ্রকাশ,—সাধুগণ, ঋষিগণ ও ভক্তগণ তোমার প্রকট অপ্রকট লীলার কথা বুঝাইয়াছেন, তাহাও সত্য। কিন্তু মহাসত্য এই যে তুমি চির-প্রকট—তোমার অপ্রকটতা নাই, অদর্শন নাই, তুমি নিত্য শাশ্বত ও সনাতন। তুমি তোমার নিত্য লীলায় নিত্য বর্ত্তমান। প্রতি পরমাণুতেই তোমার আনন্দনৃত্য বর্ত্তমান। যে দেখিতে জানে—সে দেখিতে পায়।

কিন্তু এ ক্ষুদ্রচেতার সে সৌভাগ্য নাই—সে সাধনা নাই। তুমি সহজ হইয়াও সাধনার ধন। তুমি সুলভ হইয়াও অতি দুর্লভ—অতি নিকটস্থ হইয়াও বহু দূরস্থ। তোমার আনন্দ-

বৃন্দাবনে প্রবেশ-অধিকার সকলের পক্ষে সহজ না হইতেও পারে। শ্রীরাধারাণীর কৃপা ভিন্ন বৃন্দাবন লাভের উপায় নাই। অথবা শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত আনন্দলীলা-রসবিগ্রহের শরণ-গ্রহণ ভিন্ন সে রসাস্বাদনের সুবিধা নাই। কিন্তু তোমার প্রকৃতিময়ী সৃষ্টি-রাজ্যে তোমার অস্তিত্বের অনুভব পর্য্যন্ত না হওয়ায় হৃদয় একবারেই মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। হে চির-সরস, এ মরু কি তোমার কৃপা-বর্ষণে বঞ্চিত থাকিবে ?

তুমি, সাধনার ধন,—বিনা সাধনে তোমায় লাভ করা যায় না ইহা জানি, সাধনা আমার পক্ষে অসম্ভব ইহাও জানি, তথাপি তোমায় চাই—ইহা দুরাশা। কিন্তু ভরসা এই—যে তুমি দয়াময়।

জয় হরি, কৃপা কর।

জয় হরি, কৃপা কর, তোমার ভক্তগণের নিকট যেন তোমারই কথা বলিতে পারি, যেন তোমারই সংবাদ দিতে পারি, যেন তোমারই অমল ধবল শুভ্রমহিমজ্যোতির গৌরব-বৈভব প্রকাশ করিতে পারি। তুমি সুন্দর! তুমি মধুর! তুমি সুনির্ম্মল! যেন তোমার চরণের দিকে চাহিয়া,—তোমাকে চিনিয়া,—তোমার ধ্যান করিয়া,—তুমি-ময় ভাবে বিভোর-বিভাবিত হইয়া,—বিভল

ব্যাকুল হইয়া—হাসিয়া কাঁদিয়া, নাচিয়া গাইয়া জগতে যেন তোমার সংবাদ জানাইতে পারি,—জয় হরি, কৃপা কর।

বনে বনে, বনমালি, তোমাকে দেখিতে চিরদিনই ভালবাসি। নিকুঞ্জবিহারী হরি, তাই ঘর ছাড়িয়া বনে থাকিতে ভালবাসি, এ রাজ-ঠাঠ-হাতি ঘোড়ার রাজ্য তোমারি, কিন্তু মন এখানে ঠিক তোমার সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হয় না, এক হইতে জানে না। কিন্তু লতায় পাতায় ফুলে ফলে তোমায় দেখিতে পাই, বুঝিতে পাই, ধরিতে পাই, তুমি সেখানে কি সরল! কি সুন্দর! কি মধুর—আমারই প্রাণের ঠাকুর।

ছোট ছোট কাল কাল সরু সরু পাখী, খুবই ছোট ;—গাছের পাতার আড়ালে অস্ফুট শব্দে এক পাতা হইতে অন্য পাতায় উড়িয়া পড়ে, পাতাগুলি নাচিয়া উঠে, দেখিয়া আমার প্রাণও নাচিয়া উঠে। মনে হয় আমার সেই কাল পাখী কবে আমার হৃদয় লতিকার পাতায় পাতায় অমন করিয়া নাচিয়া নাচিয়া,— আমার বুক ভরা ধন,— কবে আবার আমার হৃদয়ে লতায় আসিয়া দাঁড়াইবে? এমন শুষ্ক মরুতে কবে আবার সেই ভাব-মন্দাকিনীর মৃদুল কল্লোল শুনিতে পাইব, কবে এ হৃদয়ে আবার সে সুখরসে পরিষিক্ত হইবে?

লতার হরিত পাতাগুলির মাঝে মাঝে সাদা সাদা ছোট ছোট ফুল—গন্ধ আছে কি না, জানি না, আমি সে জন্য ফুলের দিকে তাকাইনা—আমি দেখি ঐ ছোট ফুলগুলি কেমন সরস, কেমন সরল ভাবে জগতের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। উহারা

কাহারও যশ গৌরব খোঁজেনা, কে ভাল বলিবে, কে মন্দ বলিবে তাহা একেবারেই ভাবে না, ভাবিতেও জানে না;—স্বীয় সরল, কোমল, গর্ব্বহীন, দম্ভহীন এমন কি আত্মহীনভাবে জগতের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। উহারা কাহারও অপমান করে না, কাহাকেও কটু কথাটী বলে না, কাহারও কিছু চাহে না, অথচ যেন কোমল মধুর স্বার্থলেশহীন ভালবাসার নয়ন খুলিয়া জগতের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। জয় হরি, তুমি আমায় ঐ ছোট ছোট সাদা সাদা ফুলগুলির মত করিয়া দাও, আমি যেন উহাদের ভাবে তোমার দিকে দিবানিশি তাকাইয়া থাকিতে পারি।

এ সংসার—নরনিবাস,—এখানে কেবল আদান-প্রদান। দান করিলে প্রতিদানে কিছু পাই, মিষ্ট কথা বলিলে মিষ্ট কথা শুনিতে পাই, কঠোর ব্যবহার করিলে তখনই বজ্রনাদে তাহার প্রতিদান আসে। আবার এমনও ঘটে, যে এক বিন্দু জলের জন্য শুষ্ক কাতর কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিলে প্রতিদানে ভীষণ বজ্র মাথায় আসিয়া পড়ে। এ রাজ্যের এই নিয়ম,—এ রাজ্যের ইহাই রীতি। কিন্তু নিকুঞ্জবিহারি, তোমার নিকুঞ্জ বনের এ ভাব নয়— উত্তেজনার কঠোরতা, অশান্তির ঝড় বিদ্বেষের কুলিশ-পাত তোমার কাননে এক বারেই দেখিতে পাই না। তুমি সেখানে কোমলতার মধুর রাজ্য পাতিয়া রাখিয়াছ, তুমি সেখানে ফুলের মাঝারে স্নিগ্ধ মধুর সরল হাসির বিকাশ করিয়াছ। জয়হরি, দুই দণ্ডও তোমার কুসুম কাননে বসিয়া থাকিলে তোমারই আভাস পাই।

তুমি সর্ব্বব্যাপী, তুমি শাশ্বত, তুমি, সর্ব্বশক্তিমান্—এ সকল কথা সত্য হইতে পারে,—হইতে পারেই বা বলি কেন? যাঁহারা জ্ঞানী,— যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা তো ইহাই নিশ্চয় করিয়াছেন। তা হউক, কিন্তু এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে অত কথার স্থান নাই, অত বুঝিবার অধিকার নাই। তুমি কৃপা করিয়া আমায় তোমার বিশাল বনের এক কোণে স্থান দাও। তোমার লতা পাতাই আমার চির সহচর, তোমার ফুলের সুনির্ম্মল সরল শুভ্র স্নিগ্ধ হাসিই আমার জীবনের জ্যোতি; মধুময়—চিরসুন্দর—প্রাণের চির সখা—জয়-হরি, আমায় কৃপা কর, প্রাণের বান্ধব, আমাকে তোমার বন-ভ্রমণে লইয়া চল।

শ্রাবণ ভাদ্রে শ্রীশ্রীব্রজধামের তীর্থযাত্রী বন ভ্রমণ করেন। তাঁহারা ভাগ্যবান্; বর্ষার কলধৌত বনের তরুলতা বল্লরীর শ্যামল সুন্দর শোভা দর্শনে তোমারই আনন্দময় বিমল রাজ্য বিচরণ করেন। কিন্তু এ দুর্ব্বলের সে সামর্থ্য নাই, হে দুর্ব্বলের সখা, দীনের বন্ধু, পতিতের প্রাণারাম চির সহচর,—হে আন্ধারের আলো—একবার কৃপা কর—আমায় তোমার বনে লইয়া চল। এ মলিন—এ কৃত্রিমকে—কৃত্রিমতার মধ্যে—মলিনতার মধ্যে আর রাখিও না। জয় হরি—অধমতারণ একবার, কৃপা করিয়া তোমার বনভূমির সরল মধুর ভাব-সুধায় এ দীনের চিত্ত পরিষিক্ত করিয়া দাও—দীন কাঙ্গালের প্রাণের ঠাকুর, এখন একবার এই ভাবে কৃপা কর।

চির-মধুর।

হে আমার চির-মধুর, মনে করি, তোমার চরণতলে বসিয়া তোমার সেবা করিব; তোমার তরুলতাময় কুসুমিত কুঞ্জে তোমারই মাধুর্য্য-অনুভবে—তোমারই ভাবে মজিয়া থাকিব; কিন্তু পলকের তরেও সে সাধ পূরাইতে পারি না, কত জঞ্জাল, কত ঝঞ্ঝাট দিন-যামিনী আমার হৃদয়ের উপরে চাপিয়া রহিয়াছে। দিনে একটিবারও তোমার নিকট ছুটিয়া যাইতে অবসর পাই না। জানি না এমন ভাবে আর কতকাল দূরে দূরে থাকিয়া তোমার সেবা-ব্রত হইতে বঞ্চিত থাকিব?

অসতী রমণী স্বামীর নিকট আত্মসুখের কামনা করে, নিজ দেহের প্রীতির জন্য স্বামীকে ব্যাকুল করে, কিন্তু স্বামীর সেবা করে না, সেবা করায় যে কি আনন্দ তাহাও জানে না—সে অবস্থায় দুঃখেও যে পরম সুখ তাহা সে জানে না।

হে অন্তরের প্রিয়তম দয়িত, তুমি তো জান, আমি তোমার নিকট আত্মসুখের কামনা করি না। তুমিই আমার সুখ-স্বরূপ। তোমাকে পাইলে আমি আর কিছু চাই না—হে হৃদয়েশ্বর, তুমি আমার হৃদয়ের অন্তস্তরের এ বাসনা জান। তোমার নিকট লুকাইবার আমার আর কিছু নাই। সে প্রয়াসও বৃথা। তুমি অন্তরজ্ঞ।

আমি সকল ত্যাগ করিয়া তোমারই শ্রীপদে জীবন সঁপিয়া

তোমার সেবা করিতে পারিলে এ জীবনের সকল বাসনা চরিতার্থ হয়, মনও তাহাই চায়। কিন্তু কি বিড়ম্বনা,—যত জঞ্জাল ও ঝঞ্ঝাট জড়াইয়া এখানে বাতুলের মত বিচরণ করিতেছি। এ বন্ধন কেন? বহুল যত্নেও এ বন্ধন ছিন্ন করা সম্ভবপর হইল না।

এই অপরাধময় জীবনের পরিণাম যে এমনই বিষময় হইবে তাহা ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিতেছি। নিজে অসমর্থ—কিন্তু হে মধুময় তুমি সমর্থা রতির লভ্য। তাই মনে হয়, সুধু সাধেও চলে না, সমর্থারতি ভিন্ন তোমার সেবার অধিকার হয় না। তোমার মাধুর্য্য-আস্বাদনে কাহার লালসা না হয়, কিন্তু সুধু লালসায় বুঝি তোমাকে পাওয়া যায় না। তবে যদি লালসার তীব্রতা তোমার সেবাধিকার লাভের একটা সাধনা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার সে সাধনা নাই—কোন সাধনাই নাই—অথচ আব্দার আছে,—আমি তোমায় চাই! একি হৃদয়ের সুধুই ছলনা—একি আত্ম-প্রতারণা! এ বিড়ম্বনার অর্থ কি? কিছুই তো বুঝিতে পারি না। তোমাকে মনে করিলে নয়নে ধারা বহে, তোমাকে স্মরণ করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলি—পাছে বা কেহ দেখে এজন্য ভাব-গোপনের চেষ্টা করি,—পাছে বা কেহ কি মনে করে, এজন্য চখের জল অপরের অতর্কিত ভাবে মুছিয়া ফেলি—কিন্তু তুমি তো এ সকল বুঝিতে পার। প্রবঞ্চনা প্রতারণা বা ছলনাই বা ইহাতে কি আছে? এ সকল ঘটে,—ইহা সত্য।

কিন্তু সর্ব্বোপরি আরও একটি সত্য এই যে আমার এই রতি সতী নয়—অসতী; স্থিরা নয়—চঞ্চলা; ব্যবসায়াত্মিকা

নহে—ক্ষণিকা। তোমার ভাবে মজিয়া থাকিব, তোমার মাধুর্য্য পাথারে ডুবিয়া রহিব এ প্রয়াস কখনো হয় নাই—সে সাধনা স্বপ্নেও পরিলক্ষিত হয় নাই। তোমার নিকট আমার যদি কোন আব্দার থাকে তাহা এই যে আমি যেন তোমার মাধুর্য্যসিন্ধুতে ডুবিয়া থাকি। তুমি কৃপাময়, তোমার কৃপায় যখন পঙ্গু সিন্ধু লঙ্ঘিতে সমর্থ, আমার এ বাসনা কি তুমি পূর্ণ করিবে না? তোমারই প্রেমমাধুর্য্যে প্রমত্ত হইয়া শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গল লিখিয়াছেন—

মাধুর্য্যবারিধিমদাম্বু-তরঙ্গভঙ্গী
শৃঙ্গারসংকুলিতশীতকিশোরবেশং
আনন্দহাসললিতাননচন্দ্রবিম্ব-
মানন্দসংপ্লবমনুপ্লবতাং মনো মে।

এই নিখিল বিশ্বের সর্ব্বত্রই তোমার মাধুর্য্য বিরাজিত। হে মধুময় তাই ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে—"মধু বাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" ইত্যাদি। তুমি নিখিল মাধুর্য্যের নিদান। তোমার এই মাধুর্য্য কেবল প্রেমময়ী ব্রজবালাদেরই আস্বাদ্য। স্বয়ং তুমি শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীগৌররূপে শ্রীরাধার ন্যায় স্বীয় মাধুর্য্যাস্বাদনার্থ অবতীর্ণ হও। তাই শ্রীপাদ স্বরূপ লিখিয়াছেন—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনোদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ
সৌখ্যং চাস্যাঃ মদনুভবতঃ কীদৃশোবেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।

শ্রীল বিল্বমঙ্গল তোমারই মাধুর্য্য-সুধায় প্রমত্ত হইয়া বলিয়াছেন—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।

এইরূপে ভক্তগণ যে তোমার মাধুর্য্য সম্ভোগ করেন তাহারও প্রমাণ পাই। হে নাথ এ দীনকে সে রসে নিরাশ করিও না।

বর্ষায় শ্রীশ্রীব্রজভূমি

প্রতিবর্ষেই বর্ষাকালে বর্ষাণের কথা মনে পাড়, নন্দগ্রামের কথা মনে পড়ে, শ্রীবৃন্দাবনের কথা মনে পড়ে, আর রহিয়া রহিয়া মনে পড়ে—ঐ রাধাকুণ্ডের কথা। প্রাবৃটের ব্রজভূমি কি সুন্দর কি মধুর! শ্যামসুন্দরের সেই অনন্ত সৌন্দর্য্য-শ্যামল-শোভাময়ী সেই ব্রজভূমি বর্ষাগমে যে অভিনব ভাবরস হৃদয়ে আনিয়া দেন, তাহার বর্ণনা অসম্ভব, ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আমি স্বপনে স্বপনে সুখের স্বপনের ন্যায় জাগিয়া জাগিয়াও সে স্বপন দেখিতে,—তাহার ভাবনা করিতে ভালবাসি, ভালবাসি কেন—মন কেবল উহাই ভাবিতে চায়—সে ভাবনা ছাড়িতে চায় না,—বোধ হয় ছাড়িতে পারে না।

আমি অনেক দিনকার কথা বলিতেছি, তখন আমার মন এরূপ ছিল না। তখন শ্রীশ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী রাধারাণী আমার

হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার অনন্তমাধুরী আমার হৃদয় জুড়িয়া থাকিতেন, হৃদয়ে বিষয়ের সম্বন্ধ ছিল না, সরল মনে ষোল আনা প্রাণে ব্রজভূমির আনন্দ উপভোগ করিতাম, ব্রজের ধূলায় ধূষরিত হইয়া বনে বনে বেড়াইতাম—হরি হরি সেই এক দিন আর এই এক দিন ! শ্যাম যমুনার শ্যামল তটে,—শ্যামল লতা বিতানময়ী লীলাকুঞ্জে ব্রজবিহঙ্গগণের রসরঙ্গময় কলকণ্ঠে যে আনন্দ লহরী হৃদয়ে ছুটিয়া বেড়ায়, তাহা মানুষের ভাষায় ফোটে না,—ফুটিতেও পারে না। সে রস ব্রহ্মানন্দকে তুচ্ছ করে, সে রস অন্য স্মৃতির অপসরণ করিয়া মানুষের হৃদয়ে স্বীয় রাজ্য স্থাপন করে, মানুষের হৃদয়কে সেই রসে অভিষিক্ত করিয়া রাখে।

এখন শ্রীশ্রীরসরাজের লীলারসময় শ্রীধাম হইতে দূরে, অতি দূরে সরিয়া পরিয়াছি। সে প্রত্যক্ষ এখন আর নাই, এখন স্বধুই স্মৃতি—আর তাহার সাথে সাথ এক একটি প্রতপ্ত দীর্ঘশ্বাস—আর নয়নে দুই একটি অশ্রুবিন্দু।

বর্ষা প্রতি বর্ষেই আসিতেছে ও যাইতেছে। কিন্তু এখন আর সে প্রত্যক্ষ নাই। সেই নয়নরঞ্জন চিত্তবিনোদন, ব্রজেন্দ্রনন্দনের সুন্দর শ্যামল লীলাবিলাস ভূমির সেই সুখময় দৃশ্য চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন।

মেঘমেদুর আকাশের তলে শ্যামল তমাল তরুনিচয়ের ললিত স্নিগ্ধ কোমল শোভায় রাসবিহারী রসরাজের রসময় রাজ্যের যে শোভা অনুভব করিতাম,—বর্ষার জল-ধারায় কলধৌত তরুবল্লরীর শ্যামল পত্রাবলীর নয়নরঞ্জন দৃশ্যাবলীর মধ্য হইতে যখন শ্যামসুন্দর

আমার নয়ন গোচর হইতেন,—আর দশ দিকে আমি সেই আনন্দমূর্ত্তি-বিচ্ছুরিত আনন্দ-তরঙ্গ অনুভব করিতাম,—লতায় লতায় পাতায় পাতায় ফুলে ফলে সর্ব্বত্রই আনন্দ-ব্রহ্মের সত্তা অনুভব হইত,—তখন ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব স্বতঃই এই দরিদ্র হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়া এ কাঙ্গালকে ব্রজধামের সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যের মহাবৈভবে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিতেন—দুঃখ কাহাকে বলে জানিতাম না, সেই আনন্দ তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতাম।

আজও সেই মেঘমেদুর আকাশ; এখানে এখনও সেই বর্ষার বাদল, আমার নয়নের সম্মুখেই কদম্বতরুর শ্যামল পত্রাবলিতে এখন ও বর্ষার বারিধারা পতিত হইতেছে। অদূরে তরুলতা বল্লরীও শোভা পাইতেছে—কিন্তু এখানে সে রস নাই, সে শোভা নাই, সে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য নাই, তাহার কিছুই নাই—এখানে কেবল হা হুতাশ, কেবলই দীর্ঘশ্বাস; এ কি যাতনা, এ কি ভাবনা! আমার সে সুখের স্মৃতিটুকু,—আমার সেই ভরসা টুকু,—যাহা কাঙ্গালের মাণিকের ন্যায় কত যত্নে হৃদয়ে রাখিয়াছিলাম—আমার সেই ব্রজরসের স্মৃতিটুকু এ পাপ পঙ্কিল হৃদয় হইতে কে মুছিয়া ফেলিল? খুঁজিয়া দেখিলাম, এখানে এখন আর কিছুই নাই। কেবলই মরুভূমি। হায় হায়, শ্যামসুন্দর কোথায় তুমি!

আর না বাজিল বাঁশী

দিন যায়—অতি বড় হাহাকারের দিনও চলিয়া যায়—থাকে না। কিন্তু সব ফুরায় না। ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ সকলই এই স্মৃতিতে বিজড়িত—স্মৃতিতে অবরুদ্ধ। সুতরাং সব ফুরাইলেও সব ফুরায় না—যদি স্মৃতি না ফুরায়। এইখানেই যত গোলযোগ। স্মৃতির সমাধি-মন্দিরেই অপ্রত্যক্ষ দেবতার পূজা হয়। দেবতা বিসর্জ্জন হয়, কিন্তু পূজার বিসর্জ্জন হয় না, শ্রীমূর্ত্তি প্রত্যক্ষের অতীত হয়েন, কিন্তু স্মৃতিতে তাঁহার ধ্যান থাকে।

সুখ চলিয়া যায়—সুখের স্মৃতি থাকে, কিন্তু তাহাতে কি সুখ আছে? প্রত্যুত তাহা দুঃখের উদ্রেক করে। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সম্বন্ধ সূচিত করিয়া সময়ে সময়ে স্মৃতি মানুষকে বিহ্বল করিয়া তোলে। স্মৃতিতে ও অনুভবে এই মেশামিশি ভাব,—মানব চিত্তবৃত্তির সুখ-দুঃখের উদ্বোধক। যাহা ছিল, তাহা নাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজিলেও আর তাহা মিলিবে না—হায়, তাহা কোথায় গেল, কি হইল—এই যে স্মৃতির অন্তর্দাহী অনন্ত অনল-তরঙ্গ ইহা হইতেই ব্রজ-বিরহের অশেষ কাব্যের উৎপত্তি। ইহা হইতেই—

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমা ক্ব শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব মন্দমুরলীরবঃ ক্বনু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব জীবরক্ষমহৌষধি
নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক্বনু হন্তহাধিগ্‌বিধিম্‌।

শ্রীরাধিকার এই হৃদয়বিদারী মহাবিরহের হাহাকার।

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং
স্মরতি মনোমম কৃতপরিহাসম্।

রাসের রস ফুরাইয়া গেলেও স্মৃতিতে তাহার উৎসব-ঝঙ্কার থামিল না। রাসবিলাসের রসময় নায়ক যে মঞ্জুমধুর সরস বচনে পরিহাস করিয়াছিলেন, এই মহাবিরহের দিনে একে একে শ্রীরাধা-হৃদয়ে তাহা উদিত হইল। কিন্তু অনুভবকালে যাহা সুখের তরঙ্গ-তুফান তুলিয়াছিল, স্মরণকালে তাহাই আবার মরণ-যাতনা লইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু এমন ভীষণ স্মৃতি ছাড়িবারও তো উপায় নাই। ঝলকে ঝলকে সেই সুখময় দৃশ্য স্মৃতির নয়ন-কোণে উপস্থিত হইলেও, অনুভব বিহনে তাহা চিত্তের সুখকর না হইয়া যাতনার অনল জ্বালিয়া দেয়।

এ সকলই স্মৃতির উপদ্রব-অত্যাচার ও উৎপীড়ন। তবে এ ছলনা কেন, এ বিড়ম্বনা কেন, যাহা মিলিবে না তাহার ভাবনা কেন? এ 'কেন' বুঝাইয়া দেওয়া সহজ নহে। পূর্ব্বেই তো বলিয়াছি, যখন স্মৃতি ফুরায়—তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মহাপ্রলয়ে বিলীন হয়, মহাশূন্যে সকলই বিলুপ্ত হইয়া যায়। স্মৃতি ফুরাইলে জগৎ-শৃঙ্খল বিনষ্ট হয়—কার্য্যকারণ-প্রবাহ বিধ্বস্ত হয়—সর্ব্বসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়—জ্ঞান-বিজ্ঞান ভক্তি-প্রীতি সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যানুভবাদির অস্তিত্ব সহসা অবলুপ্ত হয়। তাই বুঝি বিশ্বনিয়ন্তা সমগ্র চিদ্-ব্যাপারের মাঝখানে এই স্মৃতির শৃঙ্খল জুড়িয়া দিয়াছেন। স্মৃতির শৃঙ্খলে অবরুদ্ধ হইয়াই অতীত ও বর্ত্তমানের নিত্যতা বজায়

রাখিতেছে। যাহা যায় বলিয়া মনে করি, গিয়াছে বলিয়া মনে করি, তাঁহার কিছুই যায় না, কিছুই যায় নাই—সকলই ঐ স্মৃতির মন্দিরে সমাহিত—কোনটী ঘুমন্ত, কোনটী আধ ঘুমন্ত—কোনটী জাগরিত- কোনটী অতি জাগরিত ও তীব্র। কোনটী সদ্যো-জাত শিশুর ন্যায় জাগিতে না জাগিতেই ঘুমাইয়া পড়ে, কোনটী খেলিতে খেলিতে ঘুমাইয়া পড়ে, কোনটী তেজস্বী কর্ম্মঠ যুবকের ন্যায় ঐ স্মৃতির মন্দিরে অনলস অনিদ্রভাবে দিবানিশি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। স্মৃতি-মন্দিরে ঐ ষোল আনা মালিককে আমরা চেষ্টা করিয়াও উচ্ছেদ করিতে পারি না, সে চেষ্টার বিষময় ফলে নিজেরাই উচ্ছন্ন হই—হৃদয় তখন মহাশ্মশানে পরিণত হয়। এইরূপেই মানুষের জীবন চলিয়া যায়—এইরূপেই সংসার চলি-তেছে ও চলিবে। কিন্তু বিশ্বস্থিতির মূল, বৈষ্ণবীশক্তি স্মৃতিও তেমনি বিশ্বব্যাপার-বোধের সংরক্ষয়িত্রী। ইহাতেই সুখ দুঃখ গাঁথা থাকে।

যমুনা-পুলিনে মধুর নিক্বণে শ্যামের মোহন মুরলী বাজিল, কাণ পাতিয়া শ্যাম-সোহাগিনী তৃষাতুরের ন্যায় সে মুরলী-রব-সুধা পান করিলেন, কিন্তু শুনিতে শুনিতেই প্রতিপদের চাঁদের মত সে রব আকাশে মিলাইয়া গেল। কিন্তু তাহার ঝঙ্কার গেল না—দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল—সে মন্ত্রমুরলীর মোহন ধ্বনি আর শুনা গেল না। ইহার পরেই মাথুর বিরহ। তখন সে নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়—সে শিখিচন্দ্রিকা-উদ্ভাসিত শ্রীমুখ-মণ্ডল-মাধুর্য্যই কোথায়—আর সে মন্ত্রমুরলীর মোহন রবই বা

কোথায়? বাঁশী থামিল—তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজের রস ফুরাইল, আনন্দ ফুরাইল—সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য উৎসাহ উদ্যম সকলই ফুরাইল—ব্রজের জীবনপ্রবাহ পর্য্যন্ত নিরুদ্ধ হইয়া গেল। এক বাঁশীর গানই ব্রজের প্রাণপ্রবাহ, আর সে তানের নিরোধেই ব্রজের মরণ। সে ধ্বনি যখন নীরব হইল, তখন -

যা ছিল তা চ'লে গেল
যা র'ল তা সুধুই ফাকী।

আর বাঁশী বাজিল না, আর ব্রজবাসীও জাগিল না। এইরূপে নিত্যলীলা অপ্রকট হইলেন। তথাপি এখনও তাহার স্মৃতি আছে—সে স্মৃতি যাইবার নয়—বুঝি চিরদিনই থাকিবে। জ্বলে তাহাতে হৃদয় জলুক—কিন্তু তথাপি তো সেই বাঁশরীরই স্মৃতি।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ

শ্রীগৌরলীলার শেষ দ্বাদশ বৎসর এক মহাবিরহের প্রতিচ্ছবি। হৃদয়ে যাহার অহরহ বিরহের মহাশ্মশান ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে, প্রাণের প্রাণ,—প্রাণবল্লভের বিরহে ব্যাকুল প্রাণ আকুলিবিকুলি করিতেছে, দূর হইতে সেই পতি-বিরহিণীর শ্মশানজ্বালার ব্যাকুলতা প্রত্যক্ষ করিলে গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতিচ্ছবির কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

সেই পরিমৃদিত কমলের ন্যায় বিরহ-পাণ্ডুর মুখখানি,—সেই

শ্রীমুখে মণিমুক্তার মোহনমালাবিনিন্দি নিরন্তর অশ্রুবিন্দুর অবিরল প্রবাহ—সেই হৃদয়শোষি উষ্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস,—সেই গদ্‌গদ্ কণ্ঠে "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" ধ্বনির আর্তিপূর্ণ করুণ স্বর,—আর সেই আগ্নেয় গিরির সমুচ্ছ্বাসের ন্যায় মর্ম্মান্তিক হৃদয়বিদারি বিরহপ্রলাপ—হরি হরি—সেই বাউল সন্ন্যাসীর কথা মনে করিলেও প্রাণ বিদীর্ণ হয়, দেহ শিথিল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। গম্ভীরার সেই হৃদবিদারক চিত্র প্রকৃতপক্ষেই ভীষণ ক্লেশকর ও দুঃসহ। মনে করি, হৃদয়ে এ চিত্র আঁকিব না; মনে করি,সে চিত্র কাহাকে দেখাইতে প্রয়াস পাইব না; মনে করি, উহা দেখিতে কাহাকে অনুরোধ করিব না; কিন্তু চেষ্টা করিয়াও মনের আবেগে চাপা দিতে পারি না। যখন বিজনে নীরবে বসিয়া থাকি, সেই কাঁদ-কাঁদ বিরহ-ব্যাকুল মুখখানি মনে পড়ে, সেই অস্থিরতা আসিয়া আমায় অস্থির করিয়া তোলে, প্রেম-পাগলের ব্যাকুলতার আমিও পাগল হইয়া পড়ি। মনে হয়, যেন অমানিশির দীর্ঘ রাত্রি সম্মুখে করিয়া গৌর আমার, গম্ভীরার নিভৃত নির্জ্জনে কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইতেছেন, "কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ" রবে হাহাকার করিতেছেন, কখনও রামরায়ের সুধামাখা কৃষ্ণ কথায়, কখনও বা স্বরূপের মধুময় গানে নিদারুণ বিরহব্যথায় প্রভু কিয়ৎক্ষণ সান্ত্বনা লাভ করিতেছেন, আবার বিরহ ব্যথা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইতেছে। তাঁহার মুখে অন্য কথা নাই, সারানিশি কেবল ঐ হাহাকার।

ঐ যে অদূরে অনন্ত বিসারী নীলজলধির উত্তাল তরঙ্গ কল্লোল—উহা আমার বিরহ-ব্যাকুল শ্রীগৌরাঙ্গের ব্যাকুলতারই প্রতিধ্বনি

করিতেছে, পুরীধামের নৈশনিস্তব্ধতার মধ্যে সহসা যেন কৃষ্ণনামের তরঙ্গ উঠিয়াছে, আর সমগ্র জগৎ যেন বিরহব্যাকুল শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহ ব্যাকুলতায় আকুল হইয়া পড়িয়াছে। আমার গোরা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে বলিতে সহসা নীরব হইয়া পড়িলেন। ও-কি ও। হায় কি হ'লো। আজ স্বরূপ কাছে নাই, রামরায়ই বা কোথা। "গোবিন্দ", "গোবিন্দ", "গোবিন্দ", হায় হায় সাড়া নাই, গোবিন্দও ঘুমাইয়াছে। এ কি হ'লো, গৌর বুঝি অচেতন হইলেন, শ্রীমুখখানি এমন হইল কেন? টিপ্ টিপ্ আলো জ্বলিতেছে, হায় একি? চোখের তারার একি দশা!—গোবিন্দ, গোবিন্দ, জাগিয়া দেখ প্রভুর আজ একি দশা। গৌর অবশ হইয়া পড়িলেন, কপালের ঘর্ম্মবিন্দু ক্রমেই সমগ্র মুখমণ্ডলকে পরিস্নাত করিয়া তুলিল, কণ্ঠে ঘর্ঘর শব্দ, গোলোকের আনন্দ-পুতলীর একি দশা। হায় হায়! কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া আমার সোণার পুতলী আজ ধুলায় পড়িয়া মূর্চ্ছিত।

এইত গম্ভীরার চিত্র। প্রায়শঃই এই চিত্র আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছে। শরীরের বল নাই, দেহ জীর্ণ, চিত্ত অবসন্ন, তাহার উপরে আবার এই জাগ্রৎ স্বপ্নের অত্যাচার। ইহাতে কি আর হৃদয় স্থির থাকে। বর্ষার প্লাবনে ক্ষুদ্র ঝরণা জলের বেগকে আপন বুকে লুকাইয়া রাখিতে পারে না, সে প্রবাহ, দুকুল ভাসাইয়া বহিতে থাকে! মনে ত করি, এ জ্বালা কাহাকে ও দেখাইব না, এ দুঃখের কথা কাহাকেও বলিবনা, বলিয়া কাহারও ক্লেশ দিব না, কিন্তু হৃদয়ের স্তরে স্তরে আগ্নেয় গিরির বিগলিত

প্রতপ্ত গৈরিক ধাতু প্রবাহের যে তরঙ্গ উচ্ছসিত হয়, তাহা চাপিয়া রাখা সাধ্যাতীত। প্রিয়জনের নিকট দুঃখের কথা বলিলে দুঃখের লাঘব হয়, কিন্তু বলিতে বলিতে আর বলিতে পারিনা, সকল কথা ভাষায় ফোটে না, ফুটাইতেও পারা যায় না; কণ্ঠস্তম্ভিত হয়, বুকে যেন পাষাণ চাপা অনুভব হয়। মধ্যে মধ্যে প্রায়শঃই এইরূপ ঘটিতেছে। জানি না এখন উপায় কি।

প্রেমের মূল কোথায়?

মানব হৃদয়ে যে সকল বৃত্তি আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি বৃত্তি কঠোরা—অপর কতকগুলি কুসুম-কমোলা। প্রীতি ও ভক্তি এই কুসুম কোমলা বৃত্তি সমূহের অন্তর্ভুক্ত। মনস্তত্ত্বের বিচারে এখনও প্রেমের স্বরূপ নির্ণীত হয় নাই। বৃত্তিরূপ প্রেম, ক্রিয়ার প্রকাশ পায়। এই নিমিত্ত উহা মানসিক বৃত্তি রূপেই সাধারণতঃ গৃহীত হয়। জীব কোন-না-কোন কিছুকে ভালবাসে। জড়ায়ু জীবনে ও জীবের এই প্রীতি থাকে। কিন্তু বাহিরে তাহার অভিব্যক্তি না থাকায় সেই প্রীতির নিদর্শন প্রত্যক্ষ হয় না। উহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের গ্রাহ্য না হইলেও অনুমান প্রমাণের বিষয়ীভূত।

জীব মাত্রেই প্রীতি-জনক পদার্থ গ্রহণ করে, অপ্রীতিকর পদার্থ ত্যাগ করে ইহা অতি স্বাভাবিক। অতি ক্ষুদ্রতর জীবাণু-

তেও (Protoplasm) এই নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। এই প্রীতি জীব মাত্রেরই স্বাভাবিক। এই প্রীতিই জীবন-যোনি যত্নের (Law of self-Conservation) মূল। এই প্রীতি না থাকিলে জগতে জীবন-ধারা বজায় থাকিতে পারে না।

মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই রোদন করে, এই রোদনের অর্থ অপ্রীতিকর অবস্থার সংযোগ, এবং প্রীতিকর অবস্থার বিয়োগ। সারা জীবনেই এইরূপ জীবের দুঃখ ও সুখের উপভোগ হইয়া থাকে। জীব যাহা ভাল বাসে, তাহা পাইলে সে সুখী হয়; না পাইলেই দুঃখ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রেমেই জীবের পরিচালক। জীব মাত্রেই প্রেমের বস্তু খুজিয়া বেড়ায়। এই অবস্থায় প্রেম একরূপ জীবধর্ম্ম। জীব অবিদ্যার মধ্যে অবস্থান করিয়া যে প্রেমযোগ্য বস্তুর অন্বেষণ করে তাহা খাটি সুখ দিতে পারে না—সে বস্তুতে খাটি প্রেম হইতেই পারে না।

দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য পথিক যেমন নির্দ্দিষ্ট স্থান-লাভের আশায় সারা যামিনী পথে পথে ঘুরিয়া ক্লেশ ভোগ করে, কিন্তু দিক্‌ভ্রম নিবন্ধন আপন গন্তব্য স্থান খুঁজিয়া পায় না, সেইরূপ এই অবিদ্যাবিলসিত সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণ জীব প্রকৃত প্রেমজনক পদার্থ খুজিতে জানে না,—সে কখনও কামিনীতে, কখনও বা কাঞ্চনে, কখনও বা তুচ্ছ প্রতিষ্ঠায়, কখনও বা নশ্বর পুত্র কলত্রাদিতে প্রেম স্থাপন করিতে গিয়া অবশেষে নিজের বুদ্ধির ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া হাহাকার করে। এইরূপে অবিদ্যা-বিলসিত

প্রেমের প্রতারণায় সারা জীবন প্রবঞ্চিত হয়। অবিদ্যার মধ্য দিয়া প্রেম যখন যাতায়াত করে, তখন উহার বিলাস বৈভব এই রূপই থাকে।

কিন্তু যাহারা প্রেমতত্ত্বের বিচারক, তাঁহারা প্রেমের মূল কোথায় ইহার স্বরূপ কি, ইহার বিষয় কি ইহার আশ্রয় কি— এ সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করেন। তাঁহারা প্রথমতঃ প্রেম-বৃত্তির অনুশীলন করিয়া মানসিক অন্যান্য বৃত্তি নিবহ হইতে উহার বিশ্লেষণ করেন। উহারা তখন বুঝিতে পারেন যে এই প্রেম-বৃত্তি—আত্মনিষ্ঠা (inherent to soul)। তাহাদের তখন মনে হয় প্রেম আত্মার ধর্ম্ম; প্রেম,—ধর্ম্ম, আত্মা,—ধর্ম্মী। প্রেম আত্মার গুণ;—প্রেম গুণ—আত্মা গুণী। ধর্ম্মে ধর্ম্মীর যে সম্বন্ধ, গুণে গুণীর যে সম্বন্ধ—উহা সমবায় সম্বন্ধ—উহা অযুতসিদ্ধসম্বন্ধ। দুগ্ধের ধবলতার ন্যায় অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় এই সম্বন্ধ নিত্য সম্বন্ধ। সুতরাং প্রেম চিরদিনই আত্মনিষ্ঠ ধর্ম্ম।

ভালবাসা জীবের পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু বদ্ধ জীবের ভালবাসা ও মুক্ত জীবের ভালবাসার বিষয় অবশ্যই বিভিন্ন। অবিদ্যোপহিত জীবের প্রেমের বিষয় অনন্ত—অশুদ্ধ ও ক্ষণ ভঙ্গুর। অপর পক্ষে শুদ্ধ জীবের প্রীতির বিষয় এক, অদ্বৈত, নিত্য শাশ্বত ও বিশুদ্ধ রসময়। অবিদ্যাগ্রস্ত জীব নশ্বর পদার্থে প্রেম করিতে গিয়া প্রবঞ্চিত হয়, শুদ্ধ জীব নিত্যানন্দে প্রেম করিয়া নিত্যানন্দ উপভোগ করে। শুদ্ধ জীব বিমল বিশুদ্ধ অদ্বৈত জ্ঞান লাভান্তে স্বীয় বিশুদ্ধ প্রেম স্বভাবের স্ফূর্ত্তিতে রসময়

শ্রীভগবানের স্মরণ করে, তাঁহাতে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, ব্যাকুল হয়। এইরূপে আত্মারামের চিত্তও শ্রীভগবানের গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য অনুভব করিতে প্রয়াস পায়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে :—

"হরের্গুণাক্ষিপ্তমতি র্ভগবান্ বাদরায়ণঃ"

তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু অত যত্ন করিয়া "আত্মরামাশ্চ" শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া আত্মরামগণেরও প্রেম-ব্যাকুলতার ভাব দর্শন করিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, প্রীতি যে আত্মনিষ্ঠ বৃত্তিবিশেষ, ইহা যে আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি, বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্পষ্টতঃই তাহা উক্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিতেছেন :—

স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি, ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি ইত্যাদি। দ্বিতীয় অধ্যায়-চতুর্থ ব্রাহ্মণ।

সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতেও এই তথ্য প্রকটিত হইয়াছে তদ্ যথা :—

সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ।
ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যা স্তদ্বল্লভতয়ৈব হি॥ ৫০

তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্॥ ৫৪

দশমস্কন্ধ—১৪ শ অধ্যায়।

ইহা হইতে জানা যাইতেছে, আত্মাই প্রেমের বিষয়, তৎ-সম্বন্ধে হেতু অপরাপর সকল বস্তু প্রেমের বিষয়রূপে পরিণত হয়। বিশুদ্ধ জীব, আত্মাতেই প্রেম স্থাপন করেন, অবিদ্যাগ্রস্ত জীব অবিদ্যাবিলাসিত নিখিল পদার্থের কোন কোন বস্তু প্রেমের বিষয়রূপে বাছিয়া লয়। কিন্তু সাধনযোগ্য চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে আত্মাতেই প্রেম ন্যস্ত করিয়া থাকেন। প্রেমসাধনার প্রাবল্যে তাঁহারা জানিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণই নিখিল আত্মার আত্মা।

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং।
জগদ্ধিতায় সোহপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥ ৫৫

সুতরাং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই প্রেমাস্পদ। শ্রীকৃষ্ণই প্রেমের অনন্ত-বারিধি। এইরূপ সাধনের ফলে ক্রমে এই জ্ঞান দৃঢ়ীভূত হয়, যে প্রেম,—বৃত্তি নহে, প্রেম,—এক মহাশক্তি,—এক বারেই শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তি। প্রেমবৃত্তি,—উহারই স্ফুরণ-জনিত-ক্রিয়াবিশেষরূপে সাধারণতঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আত্ম-পরীক্ষা

বিষয়ী লোকেরা মনে করে, তাহারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দৈহিক অভাব নিবারণ করে, আপনাদের অভিরুচি অনুসারে আহার বিহার ব্যবহারাদি করে, দশজনকে ঠকাইয়া দশটাকা সঞ্চয় করে, তাহাদের মত চালাক চতুর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আর বুঝি এ জগতে কেহ নাই। অন্যান্য লোকেরা এতাদৃশ লোকের খুব সুখ্যাতি করে, ইহাদের অনুগত হয়, ইহাদের বাক্য ও কার্য্যে সায় দেয়। ইহাতে ইহারা মনে করে মানব সমাজে ইহারাই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, অপর পক্ষে ধর্ম্মচিন্তাশীল নিরীহ লোকগুলি একবারেই অপদার্থ।

এইরূপে এই শ্রেণীর লোকগুলি অতি সত্বরেই 'হাম বড়া' হইয়া উঠে। কিন্তু যদি ইহারা ক্ষণকালের জন্যও আত্ম-পরীক্ষা করার অবকাশ করিয়া লয়, এবং আত্মোন্নতি কাহাকে বলে, তাহা জানিতে প্রয়াস পায়, তাহা হইলে ইহারা সহজেই আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারে। এ সংসার কয় দিনের জন্য? এখানকার ভোগইবা কয়দিনের জন্য? যে দেহদ্বারা এ জড়জগৎ ভোগ করা যায়, সে দেহ ক্ষণভঙ্গুর; যে কমলার কৃপায় জগতে মানুষের এত দম্ভ, সে কৃপার স্থায়িত্বই বা কতকাল? সংসারটা এমনই নশ্বর।

এই সকল চিন্তা করা মাত্রই মানুষের স্থূল জ্ঞান একটী গুরুতর আঘাত প্রায়; মানব হৃদয়ে স্বতঃই তখন এই প্রশ্নের উদয় হয়,

অতি অল্প সময়ের জন্য যখন এখানে বাস করিতে হইবে, তখন এখানকার জন্য এত হাঙ্গামা, এত অশান্তি উদ্বেগ কেন? যাহাতে চিরশান্তি লাভ হয়, যাহাতে চিত্ত এখানকার উদ্বেগ হইতে পরিত্রাণ পায় এমন শিক্ষাদীক্ষা লাভ করা একান্তই কর্ত্তব্য। আত্ম-পরীক্ষায় এই জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে এইরূপ আত্ম-পরীক্ষার প্রশ্ন মানুষের মনে সহসা সহজে বা স্বতঃ প্রায়শঃই উপনীত হয় না। এইজন্য গুরুর প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে একটী পৌরাণিক প্রস্তাব বলা যাইতেছে। ইন্দ্র দেবতাগণের ঈশ্বর। কিন্তু স্বর্গেও হিংসা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা, প্রভুত্বপ্রিয়তা ও দানবোৎপীড়নের ভীতি প্রবলরূপেই বর্ত্তমান। দানবচরিত্রে যে দৃঢ়তা বল বিক্রম ও তপস্যারপ্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, স্বর্গের দেব-বাবুদের সে তেজ, সে ক্লেশ সহিষ্ণুতা সে তপশ্চর্য্যা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল দেব-বাবুরা পরস্ত্রীহরণে পটু, বিলাস-লালসায় প্রমত্ত, অপ্সরা-সম্ভোগ, নন্দন-কাননে ভ্রমণ, মন্দাকিনীর স্বচ্ছ শীতল প্রসন্ন সলিলে স্নান, স্বর্গীয় বারাঙ্গনাগণের নৃত্যগীতামোদে কাল-কর্ত্তন এবং দিব্যস্ত্রীকর-চারুচামর-মরুৎ-সংবীজনজনিত প্রমোদসম্ভোগ,—এইরূপেই এই দেব-বাবুদের স্বর্গ-জীবন অতিবাহিত হয়। পুণ্যক্ষয় হইলেই আবার আঁধারে দেখিতে দেখিতে মর্ত্তলোকে আসিয়া "পুনর্মূষিকো-ভব" বাক্যের সত্যতা রক্ষা করিতে হয়।

এই স্বর্গে ইন্দ্রদেব, বাবুদের প্রধানতম বাবু; ভোগৈশ্বর্য্যে চির প্রসক্ত অথচ কাপুরুষ, ও পরশ্রীকাতর। ইনি যদি শোনেন

বা যদি জানেন যে কেহ তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন, পাছে বা তিনি স্বর্গ অধিকার করেন, এই ভয়ে ধ্যানভঙ্গ করার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ স্বর্গীয় অপ্সরাদিগকে উহাদের চিত্তবিকার জন্মাইবার জন্য তথায় প্রেরণ করেন। এই ইন্দ্র এতই কামাতুর যে গুরুপত্নীর উপরেও অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হন না। ফলতঃ স্বর্গের দেবতা এতই কুলোক ও কদর্য্য। ইহার উপরে প্রভুত্বপ্রিয়তা অত্যন্ত বলবতী।

কোনও সময়ে বলবান দানবদের প্রবল আক্রমণে স্বর্গরাজ্য একবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। ইন্দ্র কিছুতেই দানবদের আক্রমণ হইতে স্বর্গরাজ্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। অবশেষে শ্রীবিষ্ণুর সাহায্যে দেবগণ আবার স্বর্গরাজ্যে অধিকারলাভ করেন। তখন বিশ্বকর্ম্মার প্রতি পুনর্ব্বার স্বর্গ-নির্ম্মাণের আদেশ হয়। বিশ্বকর্ম্মা আদেশ প্রাপ্তিমাত্র অনেক দিন ব্যাপিয়া স্বর্গের সহর নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার নির্ম্মাণ কলাকৌশলে সকলেই তুষ্টিলাভ করেন। ইন্দ্র তখন বিশ্বকর্ম্মাকে অবসর না দিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখেন। ভোগবিলাসী লোকগুলি স্বভাবতঃই খুৎ খুঁতে হয়, ইন্দ্রও সেইরূপ ছিলেন। ইন্দ্র পুনশ্চ পুরী নির্ম্মাণের প্রকল্পনা করিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে বিদায়ের অনুমতি দিলেন না।

বিশ্বকর্ম্মা নিষ্কর্ম্মা হইয়া ইন্দ্রের ভবনে বাস করা অসুবিধাজনক মনে করিয়া ব্রহ্মাকে স্বীয় দুঃখের বিষয় জানান। ব্রহ্মা দেখিলেন দুর্দ্দান্ত ইন্দ্র তাঁহার আদেশ মান্য করিবেন না। তিনি নারায়ণকে এই বিষয় জ্ঞাপন করায় নারায়ণ ব্রাহ্মণবালক মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া

ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া স্বীয় বিস্তার প্রভাবে ইন্দ্রকে বিমুগ্ধ করেন এবং একজন বৃদ্ধ ঋষিকে সেই স্থলে আনয়ন করেন।

ইন্দ্র সেই ঋষিকে দেখা মাত্রই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, ঠাকুর আপনার নিবাস কোথায়? ঋষি প্রত্যুত্তরে বলেন, আমার জীবন অতি অল্পকাল এইজন্য কোথাও নিবাস নির্ম্মাণ করি নাই। ইন্দ্র বলেন আপনি আর কতকাল বাঁচিবেন, ঋষি বলিলেন, অতি অল্পই আমার পরমায়ু। এই দেখ আমার বক্ষের কয়েকগাছি লোম ঝড়িয়া পড়িয়া গিয়াছে, মৃত্যুর নিশান দেখা দিয়াছে। তোমার ন্যায় চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের জীবন কাল শেষ হইলে আমার এক এক গাছি লোমের পতন হয়, এই দেখনা আমার বুকের কতকগুলি লোম পড়িয়া গিয়াছে। আমার সমস্ত শরীরই রোমময় দেখিতেছ। আমার সমস্ত শরীরের লোম এক একটি করিয়া ঝড়িয়া পড়িবে। এক একটি লোম-পতনে চতুর্দ্দশটী ইন্দ্র ক্রমে ক্রমে কালগ্রস্ত হইবে। এইরূপে সমস্ত শরীরের লোম পতন হইলেই আমার মরণ হইবে। সুতরাং এই অল্পক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য আর মিছামিছি আশ্রম নির্ম্মাণের হাঙ্গামা করি নাই।

ইন্দ্র বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে লোমশ মুনির বাক্য শুনিতে ছিলেন, তাঁহার বাক্য শেষ হইলে ইন্দ্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিয়া বলিলেন তোমাকে বিদায় দেওয়া গেল, আর তোমার এখানে থাকার প্রয়োজন নাই। মনে করিয়াছিলাম অবসরক্রমে তোমা দ্বারা ভাল করিয়া বাড়ী নির্ম্মাণ করিব, কিন্তু

মুনির উপদেশে বুঝিলাম—এ জীবন নশ্বর—অতি নশ্বর। সুতরাং যাহাতে শান্তিলাভ হয়, তজ্জন্য আমি পুষ্করে তপস্যা করিতে চলিলাম। এই বলিয়া ইন্দ্র লোমশের উপদেশে পুষ্করতীর্থে শ্রীকৃষ্ণ ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে জীব আত্ম-পরীক্ষার সুবিধা পায়। যাহারা ঘোরতর বিষয়ী তাহাদেরও এইরূপে ধর্ম্মকর্ম্মে মতি জন্মে। আবার সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াও এক শ্রেণীর লোক আত্ম-শক্তি বুঝিতে পারে না, তাহাদের চিত্ত ঘোরতর বিষয়ানুরক্ত অথচ উহারা নিজকে সাধু ও জ্ঞাননিষ্ঠ বলিয়া মনে করে। উহাদের পক্ষেও আত্ম-পরীক্ষা অতীব প্রয়োজনীয়। চিত্তের অগোচরে তো পাপ নাই। ধীর-ভাবে চিত্তকে পরীক্ষা করিলেই জানা যায় চিত্তে কোন্ ভাবের প্রাবল্য আছে। কামিনী-কাঞ্চন, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা ও নিজেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ছাড়িয়া চিত্ত নিষ্কপটে ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইতেছে কি না ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ভ্রম-ধারণা পরিত্যাগ করা উচিত। ভিতরের ক্ষত যদি অলীক মাংসে পূর্ণ হইতে আরম্ভ হয়, ক্ষত চিকিৎসক সে পূর্ত্তিতে পরিতৃপ্ত হয়েন না, তিনি সেগুলি তুলিয়া ফেলিয়া খাঁটি মাংসে ক্ষত স্থান পূর্ণ করিতে প্রয়াস পান। সাধনার রাজ্যেও এইরূপ পরীক্ষা হওয়া কর্ত্তব্য। অলীক-ভাবের অলীক পূর্ত্তিতে ভজনরাজ্যে আত্মোৎকর্ষ সাধিত হয় না।

আনন্দ সুন্দর।

জগৎ ঘুমিয়ে যায়,
  ঘুম নাই আমার নয়নে ;
নিশীথে বাহিরে আসি
  চেয়ে থাকি আকাশের পানে।
জোছনা-হাসনি-মাখা
  শুভ্র মেঘ আকাশের গায়,—
এক আসে, আর যায় চলি
  নিরবিল শারদ নিশায়।
ধ্যানরত তাপসের মত
  রুদ্ধশ্বাস বহে না সমীর ;
স্তম্ভিত বিশ্ব চরাচর
  গম্ভীর সাধনা প্রকৃতির !
সুনীল আকাশে হাসে তারা
  ঝলকি ঝলকি জ্যোতিরেখা.
কোল শূন্য করি গেছে শিশু,*
  ফুটে ওঠে তার হাসি লেখা !
চেয়ে চেয়ে অবশ নয়ন,
  ভাতে বিশ্ব শুদ্ধ মনোহর,
মধুর উজ্জ্বল রূপে তায়
  দেখা দেন আনন্দ সুন্দর !

---

* কনিষ্ঠা ভগিনী।

জ্যোতিতে জ্যোতিতে ফুটে হাসি
হরষে হরষে মন ভোর,
শারদ নিশীথে পিয়ি সুধা
তৃপ্ত হয় চিত্ত-চকোর।

শ্রীকালীদাসী দেবী।

হরি, তুমি কোথায়?

নীরব নিশীথে নিদ্রাহীন নিরাশ হৃদয়ের যে কি যাতনা, তাহা বুঝাইবার ভাষা নাই, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করাও বিফল। যে হৃদয়, শোক স্মৃতির শতবৃশ্চিকদংশন-যাতনায় নিরন্তর দগ্ধ হয়, অথচ যে হৃদয় শবের সত্য নাড়ীর ন্যায় ভস্মীভূত হইতে জানে না—সে হৃদয়ের অন্তরস্থ তীব্র বেদনা জনসাধারণের অনুভূতি বা সহানুভূতির সাধারণতঃ দুরধিগম্য। লোক-লোচনের অগোচরে নীরবে নীরবে হৃদয় ফুটিয়া যে অশ্রুবিন্দু-ধারা শোকাকুলের নয়ন-যুগল আকুল করিয়া গণ্ড বাহিয়া, বক্ষ ভিজাইয়া প্রবাহিত হয়—এ জনকোলাহলপূর্ণ স্বার্থব্যাপারময় সংসারে কয়টী লোক তাহার সন্ধান লয়,—সে নয়ন জল মুছাইয়া দিতে কে সেখানে উপস্থিত হয়? একটি একটি করিয়া যাহার সবগুলি আশার আলোক নিভিয়া গিয়াছে, দিবানিশি যাহার নিকট সমান অন্ধকার—কালের করাল দংষ্ট্রায় যাহার কুসুমকোমল স্নেহের পুতুলিগুলিকে বিচূর্ণিত করিয়া ফেলিয়াছে, সেই নিদারুণ বিষাদ বিষদগ্ধ নিরাশ

নয়নের নীরব অশ্রুজল মুছাইয়া সান্ত্বনা দিতে পারে জগতে এমন কে আছে? কেউ নাই,—কেবল তুমি আছ—হরি, তুমি আছ। তুমি যদি দয়া করিয়া বুঝাও, যে তুমি আছ তবে নিরাশা জীব বুঝিতে পারে—যে বাস্তবিকই তাহার তুমি আছ। আর তুমি থাকিলে তাহার সব আছে। তুমি এককই অনন্ত কোটী—তুমি নিরাশের আশা, বিষণ্ণের প্রফুল্লতা, আশান্তির শান্তি, তুমিই নিরানন্দের আনন্দ, ক্ষুধায় মা অন্নপূর্ণা, রোগে বাবা বৈদ্যনাথ, শোকে তুমিই প্রত্যক্ষ পুনরাগত স্বর্গীয় স্বজন, তুমি সর্ব্বনাম, সকলের প্রতিনিধি অথবা তুমিই সর্ব্বমূর্ত্তিতে প্রপঞ্চে প্রকটিত হও। তুমিই কুসুম কাননে ফুল্লকুসুম, গৃহস্থের সংসার কাননে তুমিই সুকোমল হৃদয়ানন্দি পুত্রকন্যা।

হে সর্ব্বরূপ, সর্ব্বনাম—তুমি মনে করিলে সব করিতে পার মনে করিলে এ অনবচ্ছিন্ন প্রতপ্ত অশ্রুধারা মুছাইতে পার —এ নৈরাশ্যের হাহাকার নিরুদ্ধ করিয়া দিয়া আবার আনন্দের হাসির তুফান বহাইতে পার। তুমি ইচ্ছাময় ও সর্ব্বশক্তিমান্—ইচ্ছা করিলে সকলি করিতে পার। কিন্তু তুমি কোথায়! এই ভীষণ দুর্দ্দিনে তুমি তোমার পদাঙ্ক চিহ্নটুকু পর্য্যন্তও মুছিয়া ফেলিয়া অপ্রকাশ হও,—আঁধারের উপরে আঁধার জমিয়া আঁধার আরও ঘনীভূত হইয়া উঠে। তোমার এ বিশ্ব-প্রহেলিকা বুঝিয়া উঠা যোগেশ্বরগণের পক্ষেও বুঝি বা অতি অসম্ভব। এক ঘটনার ভ্রূভঙ্গীমাত্রে তোমার বিচিত্র বিশ্ব-সৌন্দর্য্য শ্মশান-দৃশ্যে পরিণত হয়, জীবন ভারবহ হইয়া উঠে।

অবিশ্বাসে, অশ্রদ্ধায় হৃদয়ের শেষ ভরসাটুকু পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া যায়—ঐহিক ও পারত্রিক সকল দ্বারই যখন নিরুদ্ধ হয় তখন হে গতিদ, তুমি যদি এতাদৃশ জীবের গতিবিধান কর, তবেই সে পথ পায়—হে অগতির গতি—তাহা হইলেই তাহার উপায় হয়—নচেৎ জগতে এমন আর কি আছে, যাহা লইয়া তাহার বিষাদ-নিমজ্জিত ভগ্নহৃদয় আবার প্রকৃতিস্থ হইতে পারে?

তোমায় এরূপ দয়া—প্রকটন সর্ব্বত্র সম্ভবপর না হইলেও একবারে অসম্ভবও নয়। অসম্ভব না হউক—কিন্তু অত্যন্ত বিরল বলিয়াই মনে হয়। তোমার নিয়ম তুমি জান, তোমার বিচার-আচার জীবের বিচার্য্য নয়। কিন্তু এ কথা না বলিয়াই থাকা যায় না—যে এই শ্রেণীর নিপীড়িত জীব বাস্তবিকই তোমার করুণার পাত্র। যাহাদিগকে এমন ভাবে জ্বালায় জ্বালায় দিবনিশি দগ্ধ কর—তাহাদের জন্য তোমার করুণার কোমলধারা অত্যন্ত প্রয়োজন। তুমি ভিন্ন যখন আর তাহাদের গত্যন্তর নাই, তখন তোমার নির্ব্বিকার ভাব একবারেই অশোভনীয়।

তুমি জনকজননীর হৃদয়ে মমতা দিয়া,—স্নেহ দিয়া তাঁহাদের কোমল কোলে স্নেহের পুতুল দিয়া তাঁহাদিগকে কোমল স্নেহময় সেবার ভারার্পণ কর, তুমি না দিলে তাহারা এই সেবাসুখ কখনও পায় না। কিন্তু এইরূপে তাহাদের হৃদয়-ভরা ধন দিয়া আবার যখন কাড়িয়া লও,—হে দত্তাপহারিন্, তখন তাহাদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে মর্ম্মদাহী যে তুষানল জ্বলে; তুমি সে অনল প্রশমিত করিতে যদি উপায় না কর, তবে সেই শোকার্ত্ত হৃদয়ের দাবদাহ

তোমার কোমল শ্রীচরণ পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া তোমায় সন্তপ্ত করে না কি? সে প্রতপ্ত হুতাশময় দীর্ঘশ্বাস পৃথিবী ছাড়িয়া ক্রমশঃই যখন তোমার প্রীতিময় রাজ্যে উত্থিত হয়, তখন উহা কোটিগুণে বর্দ্ধিত হয়; তোমার কোমল চরণে সে ঝঞ্ঝাবাতের অভিঘাত প্রতিফলিত হয় না কি?

তুমি সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বশক্তিমান্। ইহা স্বীকার করিলেও মানিতেই হইবে যে তোমার সৃষ্ট জীবদল যখন তোমার প্রদত্ত দুঃখানলে দগ্ধ হইতে হইতে তোমার নাম করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে, তোমায় স্মরণ করিয়া অশ্রুজল বর্ষণ করে, তুমি নির্ব্বিকার ও সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও, নির্ব্বিকার ও স্থির থাকা তোমার পক্ষে সম্ভবপর নহে! যাঁহার অসীম সামর্থ্য, অনন্ত প্রভাব,—নির্দ্দয়তা কখনই তাঁহাতে থাকিতে পারে না অনন্ত বীর্য্যে অনন্ত দয়া অবশ্যই থাকা চাই। যে জ্বালায় পাষাণ গলে, যে শ্বাসে হিমাচল টলে, সে জ্বালায় তোমার কুসুম-কোমল হৃদয় অস্পৃষ্ট থাকিতে পারে না, সে ঝড়ে তোমার চরণ-কমল অটুট থাকিতে পারে না।

হে সুকোমল, হে দয়ার ঠাকুর, যেখানে রাবণের চিতার মত শোক দুঃখের মহানল নিরন্তর জ্বলিয়া জ্বলিয়া হৃদয়ের কুসুম-কোমল বৃত্তিগুলিকে ভস্ম করিতেছে—সে ভস্মরাশির উপরে বৈরাগ্য-বারাণসির মহাশ্মশানে তুমি আবার নব-বৃন্দাবন সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য প্রতিষ্ঠিত করিবে না কি? যদি কর, তবেই বুঝিব তোমার অনুভূতি আছে, তোমার সহানুভূতি আছে, তবেই বুঝিব তোমার বিচার আছে, দয়া আছে।

এস এস বঁধু এস

মনে করিয়াছিলাম প্রেমভক্তির কথা কিছু লিখিব। কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য, লিখিব মনে করিলেই তাহা লিখিতে পারি না। লিখিতে যাই এক, কিন্তু হইয়া পড়ে,—আর; সব কাজেই আমার এইরূপ। কি করিব উপায় নাই। 'প্রেমভক্তি" শিরোনামা ছাড়িয়া দিয়া লিখিতে হইল—"এস এস বঁধু এস"। ক্ষুদ্র-প্রাণ শফরী স্রোতের প্রতিকূলে চলিতে জানে না—চলিতে পারে না। হৃদয়ের স্রোতের আবেগে কি লিখিতে কখন যে কি লিখিয়া ফেলি নিজেই বুঝিতে পারি না। কিন্তু লেখা ছাড়ারও উপায় নাই—লেখা ছাড়িলেই মরণ।

নিশায় যাহার নিদ্রা নাই, তাহার যে কি দুরবস্থা, ভুক্তভোগী না হইলে তাহা কেহ বুঝিতে পারিবেন না। যৎকিঞ্চিৎ তন্দ্রায় থাকিয়া জাগিলাম। কিছুকাল পরেই দুইটা বাজিল। রাত্রি নীরব। সহসা এক পুরাতন বন্ধু আমায় স্মৃতির দুয়ারে সজোরে এক ঘা মারিয়া সেখানে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে একটুকু শিহরিয়া উঠিলাম—তখনও তন্দ্রা রহিয়াছে—কে ইনি ভালরূপে চিনিতে পারিলাম না। মনে করিলাম একি উপদ্রব—ইহাদের অনধিকার প্রবেশের আইন জানা নাই। কিন্তু তা বলিয়া আর কি হইবে। সকলেই জানেন আইন মাকড়সার জাল—উহা ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গকেই আটক করে; বলবানেরা উহা বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যায়।

যাহা হউক, আমি এইটুকু ভাবিতে না ভাবিতেই,—ইনি আমার স্মৃতির মন্দির ষোল আনা অধিকার করিয়া রাজরাজেশ্বর ন্যায় উপবিষ্ট হইলেন। তখন চাহিয়া দেখি ইনি অপরিচিত নহেন—আমারই প্রাচীন বন্ধু। বহুদিন আমায় ছাড়িয়া গিয়াছেন বলিয়া একরূপ অনধিকার প্রবেশ বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু পাঁচ মিনিট পরে আর কোনও অমিল রহিল না। তখন আমি বিস্মিতভাবে সহর্ষে অভিনন্দন করিলাম—'ওগো এই নীরব নিশীথে তুমি! এখন কোথা হইতে? প্রত্যুত্তরে জানিলাম—ইনি আনন্দ-বৃন্দাবনের ফেরৎ;—মহারাসের সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন। বাকী রাত্রে আর ঘুম হইল না, ঘুমের প্রয়োজনও রহিল না। রাত্রি প্রভাত হইল, প্রভাতে "দশদিক্ যান্তি কা কস্য পরিদেবনা" এই শ্লোকার্দ্ধের ভাব মিথ্যা হইল। বন্ধু আমায় তখনও ছাড়িলেন না। ফলতঃ শেষরাত্র হইতে আজ সারাদিনই আমি আমার বন্ধুর সহিত নিরবচ্ছিন্নভাবে দিন কাটিতেছি; অথচ কর্ম্মরাজের কর্ম্মচারীদের তাড়া। কিছু না লিখিলেই নয়। তাই এখন বন্ধুর পরিচয় দিতেছি।

বন্ধু কাহাকে বলে তাহা আপনাদের জানা আছে। তবু কিছু বলি—শাব্দিকেরা বলেন, "অত্যাগসহনোবন্ধুঃ" যিনি বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারেন না, তিনিই বন্ধু। বেদভাষ্যকার সায়ণ ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রভাষ্যে বলিতেছেন—"বন্ধনাৎ বন্ধুঃ" যিনি আত্মাকে নিজের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখেন তিনিই বন্ধু। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে আমার এই বন্ধু, যথার্থ

বন্ধু। আমি ইহাকে ত্যাগ করিলেও ইনি আমায় ত্যাগ করেন না—আমাকে ছাড়িয়াও থাকিতে পারেন না, বিশেষতঃ হৃদয়ে ইনি আমায় জড়াইয়া রাখেন সুতরাং ইনি আমার বন্ধু। ইনি আমার সহিত বাস করিতে ভালবাসেন সুতরাং ইনি আমার বন্ধু। বন্ধুত্ব সাব্যস্ত হইল। এখন ইহার আরও পরিচয় শুনুন—ইনি জাতিতে গান, বয়সে কিশোর, দেখিতে উজ্জ্বল মধুর সরল ও সুন্দর—ইহার নাম 'এস এস বঁধু এস"—বাস:শ্রীআনন্দ-বৃন্দাবনের রসরাজ পল্লীতে,—রাসৌলীতে বা রাসস্থলেরই কেন্দ্রে। ইনি মহারাসের খবর লইয়া আসিয়াছেন। ইনি রাসের বিশেষ সংবাদ দাতা, ইংরেজীতে যাহাকে 'স্পেশাল রিপোর্টার বলে। খবরটী এইরূপ :—

গোপীজীবন শ্যামসুন্দর গোপীদের সৌভাগ্যগর্ব্ব-প্রশমনের জন্য রাসস্থলী হইতে অন্তর্ধান করিলে পর, ঘোর নিশীথে গোপীগণ বনে বনে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যদি এমন হৃদয়ের ধনকে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায়, তবে কেইবা তাহার অনুসন্ধান না করে? কিন্তু অধরাকে খুঁজিয়া ধরা যায় না। গোপীদের অনুসন্ধান শ্রম বৃথা হইয়া গেল—তাঁহারা নিরুপায় হইলেন। যখন তাঁহাকে ধরার আর কোন আশা রহিল না, তখন তাহারা সেই নিশীথে সকলে একত্র হইয়া বিনাইয়া বিনাইয়া তাঁহারই গুণগান করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিলেন। এ অবস্থায় রোদন ভিন্ন আর গতি কি; আর কর্ত্তব্যই বা কি? অনুসন্ধানে যে ফল হয় নাই,হইতেও পারে না—রোদনে তাহা হইল।

এখানে এক মহাশিক্ষা—অনুসন্ধান বৃথা—কেবল শ্রম মাত্র—কেবল স্থূলতুষনিষ্পেষণ মাত্র। রোদনে তাঁহাকে পাওয়া যায়। তাই শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বলিয়াছেন—

"ভক্তি ভক্তি ভক্তি—এই করে সর্ব্বজন।
ভক্তি এই কৃষ্ণ বলি স্মরণ রোদন।
কৃষ্ণ বলি কাঁদিলে সে কৃষ্ণধন মিলে।

ব্রজবালাগণ বহু অনুসন্ধানেও তাঁহাকে না পাইয়া মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন গলায় পীতাম্বর জড়াইয়া করজোড়ে সেই পীতাম্বর শ্যাম সুন্দর সহসা দেখা দিলেন—তখন গোপীরা তাঁহাদের হারাধনকে সহসা লাভ করিয়া সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখপানে তাকাইলেন। শত হৃদয়ের ভাষা হৃদয়ে তোলপাড় করিতে লাগিল, কিন্তু সহসা একটী কথাও মুখে ফুটিল না। তাঁহাদের নলিন-নয়নে ভাবসুধা সহস্র ধারায় ফুটিয়া উঠিল। এত আদরের ধন—আজ এমন মধুর মোহন দীনবেশে তাঁহাদের সমীপে সমাগত! তাঁহাকে আদর করিতে হয়—বসিতে দিতে হয়, কিন্তু যমুনা-সৈকতে বসিবার আসন কোথায়—গোপবালারা তখন কোন আসনের অনুসন্ধান না করিয়া নিজেদের কুচকুঙ্কুম-রঞ্জিত উত্তরীয় অঞ্চল* বন্ধুকে উপবেশনের জন্য পাতিয়া দিলেন আর বলিতে লাগিলেন :—

* তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজো
মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ
স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতৈঃ
রচীক্লপন্নাসনমাত্মবন্ধবে।

এস এস বঁধু এসো আধ আঁচরে বসো
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে মনের উল্লাসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি॥

কি আদর,—কি সোহাগ,—কি যত্ন! যিনি চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, প্রাণের প্রাণ, মনের মন, আত্মার আত্মা,—যিনি চির-জীবনের বাঞ্ছিত ধন—কত আশায় কত নিরাশায় যাহার জন্য দিবানিশি মন প্রাণ ব্যাকুল,—গোপীরা আজ তাঁহাদের হৃদয়ানন্দ সেই শ্যামসুন্দরকে সম্মুখে দেখিয়া প্রাণ খুলিয়া বলিতে লাগিলেন—

"এস এস বঁধু এস।"

পরিহিত বসনের অাঁচল পাতিয়া আসন দেওয়া,—এ দৃশ্যের তুলনা নাই। বসন-হরণ লীলার উদ্দেশ্য এখানে সার্থক হইল। যাহার নিকট সমগ্র হৃদয় উন্মুক্ত করিতে হইবে—তাঁহার সমক্ষে আবার বসনের আবরণ রাখা কেন? গোপীরা বক্ষের বসনাঞ্চল যমুনা সৈকতে পাতিয়া দিয়া বলিলেন—

এস এস বঁধু এসো, আধ অাঁচরে বসো,
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।

'নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি'—অতৃপ্তনয়নে কেবল চেয়ে থাকা,

তত্রোপবিষ্ট ভগবান্ স ঈশ্বরঃ
যোগেশ্বরান্তর্হৃদি কল্পিতাসনঃ
চকাশ গোপী পরিষদ্গতোহর্চ্চিত-
স্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধৎ॥
শ্রীভাগবত ১০।৩২।৩৩

আর ঐরূপ মাধুরী দেখা—গোপীজীবনের ইহাই অফুরন্ত তৃষ্ণা।*
এই সরস্ মধুর মূর্ত্তিমান্ বন্ধু আমার সমগ্র স্মৃতি দখল করিয়া আজ বিরাজমান। প্রাণে কেবল ঐ এক ঝঙ্কার—'এস এস বঁধু এস'—উঠিতে বসিতে লিখিতে পড়িতে প্রাণ জুড়িয়া ঐ এক সোহাগের—আদরের মধুময়ী ভাষা—'এস এস বঁধু এস'—কাণে ঐ এক ঝঙ্কার—"এস এস বঁধু এস।"

সমগ্র সংসারে যাহার খবর রাখে না, অনাদর করে, অন্তরে বাহিরে ঘৃণা করে, তাঁহার নিকট এই কোমল আদরের মধুময়ী ভাষা মহামন্ত্র ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সুতরাং আজকার জন্য আমার ইহাই জপ, ইহাই তপ, ইহাই জ্ঞান ইহাই ধ্যান। সুতরাং এই গানগন্ধর্ব্ববন্ধু আজ আমার হৃদয়-মন্দিরে অতিথি।

---

* Oh Lord, grant me this that I may find Thee alone, that I may open my whole heart to Thee and that I may enjoy Thee as my soul desires; and that none may look upon me, but that Thou alone may speakest alone and I do Thee as beloved speaks to beloved and friend feasts with friend. Ah Lord God when shall I be wholly united to Thee and altogether unmindful of myself? Thou in me and I in Thee' and so grant that this mutual indwelling may be abiding!

Truly Thou art my Beloved, the Choicst among thousands in whom my soul is well pleased to dwell all the days of my life.

Verily Thou art a God that hidest Thyself. There is nothing that I can give more acceptable to Thee than to offer my whole heart entirely to Thee and join myself intimately to Thee. Condescend, oh Lord, to abide with me I will gladly stay with Tnee. This is my whole desire that I may be united to Thee.—Aids to the inner life.

পূর্ব্বজন্ম

"সাধ না মিটিল আশা না পূরিল
সকলি ফুরায়ে যায় মা"

ইহা আমারই প্রাণের কথা—কিন্তু এ জন্মের নয়,—পূর্ব্বজন্মের। এক মাধবী সন্ধ্যায় শ্রীমন্দিরে বসিয়া কত কি ভাবিতেছি, সহসা পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি আসিল। তখন যেন মনে মনে ভাবিতেছিলাম একটী দীর্ঘ জীবন চলিয়া গেল—কিছুই তো হইল না। যৌবনের প্রারম্ভে যে দিন নবানুরাগের সন্ধান পাইলাম,—বুঝিলাম প্রেমই আত্মার স্বরূপ, বুঝিলাম মধুময় রসময় আনন্দময় শ্রীভগবনই প্রেমের বিষয়। সান্ধ্য রবির রক্তরাগে আমাদের রেণুকা নদীর মৃদু মঞ্জুল তরঙ্গে শতবার্ণ সোনার কনক জ্যোতি ঢালিয়া দিত; পশ্চিম আকাশে বিচিত্র চিত্রে চিত্রিত মেঘের খেলা দেখিতাম, পলে পলে মেঘগুলি কত আকার ধারণ করিয়া দেখিতে দেখিতে আকাশে মিলিয়া যাইত; রজনী গন্ধা, যুঁই, বেলা, চামেলী ও মালতী—শুভ্র সুন্দর ছোট ছোট ফুল গুলির গন্ধে আমি আমার প্রেমময়ের গন্ধ পাইতাম, জগতের মধ্যে দিয়াই আমার জগৎ-পতির প্রেম-মাধুরী দেখিয়া বিস্মিত হইতাম। শয্যায় শয়ন করিয়া যতক্ষণ নিদ্রা না হইত, ততক্ষণ এই প্রেমময়ী প্রকৃতির লীলা,—কুঞ্জবিহারী রসময় শ্রীহরির রাসলীলার দৃশ্যাবলীই মনে পড়িত। সুখের স্মৃতি বুকে লইয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম। কয়েক দিন বাস্তবিক এমন সুখময় ভাবেই কাটাইয়া ছিলাম।

অতঃপরে কিঞ্চিৎ স্বেচ্ছায়, কিঞ্চিৎ পরেচ্ছায় গার্হস্থ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম—ধর্ম্ম বলিয়াই মানিয়া লইলাম। মনে করিলাম গার্হস্থ্যই প্রেমের প্রথম সোপান। গার্হস্থ্য গ্রহণ না করিব কেন? স্বার্থত্যাগ না হইলে প্রেম জানা যায় না। যেখানে স্বার্থ সেখানে প্রেম নাই, যেখানে প্রেম সেখানে স্বার্থ নাই। গোপীরা সকল স্বার্থে তিলাঞ্জলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রেমলাভ করিয়াছেন।

নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্যদাগে
ধৌত বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু।

নিজের সকল সুখের আশা বিসর্জ্জন দিয়া গৃহস্থাশ্রমে বিচরণ করিব। নিজ দেহের প্রীতি ছাড়িয়া দিব, দিয়া সহধর্ম্মিণীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া উভয়ের আত্মা জগৎ ও জগদীশ্বরের সেবায় সমর্পণ করিব। বিধাতা তেমন সহধর্ম্মিণীই প্রদান করিলেন। গার্হস্থ্য আরম্ভ হইল। উপাসনার নূতন আলোক পাইলাম—গৃহিণীর নিকট সেবা-ব্রতের পরিপাট্য শিখিলাম। তিনি শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবার জন্য ফুলের মালা গাঁথিতেন, মন্দির মার্জ্জনা করিতেন, শ্রীমন্দির সাজাইতেন, পূজার বাসন গুলি ঝক্‌ঝক করিয়া মাজিয়া রাখিতেন, নৈবেদ্য পুষ্প পত্র ধূপ দীপ দিয়া আমাদের দেব-মন্দির খানিকে প্রকৃত দেব-মন্দির করিয়া তুলি-তেন। সে মন্দিরের সম্মুখে আসিলেই অতি বড় পাষণ্ডের হৃদয়ও ভক্তি-ভরে অবনত হইত। ভোগারাধনার জন্য তাঁহার যত্ন ও দক্ষতা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইতাম। অতি সামান্য শাক

সবজী দিয়াও তিনি এমন সুস্বাদু রন্ধন করিয়া ভোগারাধনার্থ উপনীত করিতেন, আমার মনে হইত, যেন স্বয়ং লক্ষ্মী আসিয়া এ বাড়ীর গৃহ লক্ষ্মীকে তাঁহার প্রাণেশ্বরের সেবা-কার্য্য শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

আমি যখন ভোগ দিতাম, তখন তিনি মালা জপ করিতেন, কৃতাঞ্জলিপুটে মালা হাতে করিয়া জপ করিতেন। তাঁহার ভক্তির উচ্ছ্বাস আমার হৃদয়ে আসিয়া ভক্তি সঞ্চার করিত। আমি বুঝিতাম,—ইনি প্রকৃতই আমার ধর্ম্মের সহায়। ঋষির আশ্রমে লালিতা বালিকার ন্যায় তাঁহার আকার প্রকার ভাব ভঙ্গী অতীব সরল ও ভক্তিময় ছিল। সায়াহ্নে আমাদের কুটীর আরত্রিকের ঝাঁঝর কাঁসরে মুখরিত হইত—আমার দুই একটি সাথী আরত্রিক গান করিতেন, গৃহলক্ষ্মী চামর-ব্যজন করিতেন—আমি শ্রীবৃন্দাবনের আনন্দ-তরঙ্গে ভাসিয়া ডুবিয়া এইরূপে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতাম।

এ সুখ অতি অল্প দিনই ছিল। শ্রীরাধারাণী তাঁহার সেবা-দাসীকে খুব অল্প সময়েই নিজের। চরণতলে টানিয়া লইলেন। আমি অধম পড়িয়া রহিলাম। আমার দেব মন্দির মলিন হইল, সেবার বাসনে কালিমা লাগিল, আর কেহ ফুলের মালা গাঁথিল না, হবিষ্যান্নে কোন প্রকার ভোগারাধনা হইত, আমি গৃহে না থাকিলে শ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দিরে সাঁজের বাতিও জ্বলিত না।

এই অবস্থায় আমি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহ লইয়া একদিন

ঘরের বাহির হইলাম, শ্রীবৃন্দাবনের সেবাকুঞ্জে নয়ন জলে শ্রীরাধা-গোবিন্দ, যুগল সমর্পণ করিয়া রিক্ত হস্তে পথের ভিখারী হইলাম। এইরূপে আমার সে জন্মের শেষ হইল।

এ জন্মটা বড় শুষ্ক। জপ তপ এ সকলি এখানে শুষ্ক বোধ হইতেছে। তখন প্রার্থনা ছিল, হে শ্যামসুন্দর আবার যদি মনুষ্য-কুলে জন্ম দাও, তবে নারীকুলে জন্ম দিও, যেন তোমার সেবা করিয়া মনের সাধ মিটাইতে পারি। কিন্তু কি-জানি-কেন ভগবান্ সে প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই! বোধ হয় প্রিয়তমা প্রণয়িণীর বাসনার অপূর্ণতাই ইহার কারণ। এ জন্মেও সেই সহধর্ম্মিণী বুঝি আমার যৌবনের উন্মেষে দেখা দিয়াছিলেন কিন্তু প্রতিপদের চাঁদের মত দেখিতে দেখিতে সে রজত-রেখা বাস্তবিকই শ্রীরাধাগোবিন্দের চরণারবিন্দে নয়ন রাখিয়া এ জগতের কর্ম্মভোগ চিরতরে শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এখনও আমি গৃহস্থ। কিন্তু অন্যরূপ।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী।

যাঁহার চরণ পরশে ধরণী
পাইল নূতন প্রাণ
শিখিল সেবা ; নিখিল বিশ্ব
গাইল গুণের গান।
শ্যামল যমুনা যাঁর পদরজে
নিখিল তীর্থের সার,
প্রেমের রাণী সে রাধা-চরণে
প্রণমামি শতবার।

২

বৃন্দা বিপিন কুসুম-কুঞ্জে
মধুর মুরলী তান,—
বিহগ-কূজন ভ্রমর-গুঞ্জন
কোকিলের কল গান,—
এ সব সরস সদা সুমধুর
চরণ পরশে যাঁর
প্রেমের রাণী সে রাধা-চরণে
প্রণমামি শত বার

৩

কে বাজাত বাঁশী যমুনা পুলিনে
যদি না জন্মিত রাধা,
কে চরা'ত ধেনু বৃন্দা বিপিনে
বহিত নন্দের বাধা ?
রসময়ী রাধা একলী জগতে
সকল রসের সার
প্রেমের রাণী সে রাধা চরণে
প্রণমামি শত বার।

৪

নাচিত কি কুঞ্জে ময়ূর ময়ূরী
ফুটিত কি বনে ফুল ?
হরিত শোভায় সরস সুন্দর
হ'তো কি যমুনা কূল ?
বঞ্জুল মঞ্জুল কুঞ্জ কাননে
বহিত কি সুধাধার ?
প্রেমের রাণী রাধিকা-চরণে
প্রণমামি শতবার।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।

বর্ষার প্রসার

এই আশ্বিনমাস। কিন্তু বর্ষার শ্যামল শোভা এখনও কি-জানি-কেন, নয়ন জুড়িয়া বসিয়া রহিয়াছে। মেঘমেদুর আকাশ—বনালীর সনাতন শ্যামল সুষমা ঝর-ঝর বাদর—বর্ষার বৈভবেরই কাব্যধারা এখানও বজায় রাখিয়াছে।

মনে ত করি, আর স্বপ্নের রাজ্যে থাকিব না—কবিতার স্বপনে মজিব না—কর্ম্মময় জগতের দিকে নয়ন দিব—মন দিব, কিন্তু মন তাহা মানে না। মন চঞ্চল, প্রমাথি, বলবৎ ও দৃঢ়। মন বর্ষার স্বপ্নে মাতিয়া থাকিতে চায়।

আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র চলিয়া গিয়াছে—আশ্বিন উপস্থিত। কিন্তু দিনের গতাগতি প্রকৃতি বুঝে না। তোমার আমার কল্পিত কাল-বিভাগ প্রকৃতি মানে না। প্রকৃতি এখনও বর্ষার বৈভবে পুরাদমে মাতোয়ারা। তবে কি করি বল! জানি—গঙ্গাতীরে রহিয়াছি কিন্তু তবু মনে হইতেছে, তটিনীর অপর পারে নয়ন সমক্ষে যে শ্যামল বনালী বিরাজিত—উহা শ্রীবৃন্দাবন-বনমাধুরী—সেই সৌন্দর্য্য—সেই মাধুর্য্য—সেই সুশান্ত সুস্নিগ্ধ সরস সমুজ্জল সুন্দর সুমধুর ভাবপূর্ণ—অই বিপুল বনের শ্যামল ছবি।

কুঞ্জ-কানন-বিহারী আমাদের চির সুন্দরের আনন্দ বৃন্দাবন-মাধুর্য্য-প্রকৃতই নিত্য শাশ্বত ও সনাতন। বন-বৈভবে বর্ষার বাদলে সদ্যঃস্নাত সমুজ্জল সহস্র সহস্র আনন্দমূর্ত্তি নাচিয়া বেড়াই-

তেছেন,—যেন এই দেখি, এই দেখি—এরূপ মনে হয়—কিন্তু আবার তখনই বিজলীর চমকের মত তাঁহাদের অন্তর্ধান। আলাপ নাই, পরিচয় নাই, সম্বন্ধ নাই—তথাপি চিরপিপাসু হৃদয় এই বন-বৈভবে উহাদিগের দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়।

সারাটি দিন ঝর ঝর ধারা পড়িতেছে। শ্রাবণের ধারার ন্যায় ধারার বিরাম নাই। আজ লোকজনের ভিড় কম,—নাই বলিলেও চলে। এই গভীর নির্জ্জনে আর এই বাদলে, প্রাণের মধ্যে কেবলই অই এক ভাব ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেবল ওপারের অই বন দেখা!

এপারে বসিয়া ওপারের শোভা দেখা কি সুন্দর! তোমরা যাইতে চাও—যাও। আমার সে সামর্থ্য নাই—সে সাধও নাই। আমার ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র বাসনা যদি এপার হইতেই চরিতার্থ হয়—এপার হইতেই যদি সে আনন্দ লাভ হয়—আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট! আমি ওপারের খবর লইতে একবারেই অক্ষম।

আমি বন-ভ্রমণ অপেক্ষা বনের অদূর প্রান্তে থাকিয়া বন-মালীর বন-বৈভব দেখিতে পাইলেই কৃতার্থ। তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, সেই মন দাও, সেই প্রাণ দাও—আর সেই নয়ন দাও।

আজ যেমন দিন—এমন দিন আবার সব দিনে হয় না—আকাশ বহিয়া মেঘ চলিয়াছে, চঞ্চল বাতাস গাছের পাতা, নদীর জল নাচাইয়া তুলিয়াছে—সলিল-ধারায় স্নেহসিক্ত বসুন্ধরা যেন নবরসে নাচিয়া উঠিয়াছে! প্রকৃতির এই মহামাদনী মহাশক্তির প্রকটতার

দিন বাস্তবিকই আনন্দময়। আমি না চাহিতেই দয়াময়ী প্রকৃতি-দেবী আমার হৃদয়ে আজ এই আনন্দের তরঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন। এমন কৃপা না পাইলে কি পাষাণ গলে,—পর্ব্বত টলে, মরুভূমে নন্দনশোভা খেলিয়া বেড়ায়? বর্ষার মৃতসঞ্জীবনী শক্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ—অস্বীকার করার যো নাই। নিদাঘের নিদারুণ দাহে যখন আমার সুন্দর স্নিগ্ধমধুর শোভাকুঞ্জে মরুভূমে পরিণত হয়, আমি শতবার সলিল-সেচনেও উহাকে সজীব করিয়া তুলিতে পারি না। কিন্তু বর্ষাকালে সেই মরুভূমি আবার নয়ন-সুভগ শ্যামল দৃশ্যে সজীব হইয়া উঠে। তাই মনে হয়—বর্ষা প্রাণময়ী—বর্ষা জীবশক্তিময়ী। বর্ষার সহিত সজীবতার যে সম্বন্ধ উহা নিত্য সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধের ব্যভিচার নাই। ধূমদর্শনে যেমন বহ্নির অনুমান হয়, তেমন বর্ষা দেখিলেই সজীবতার অনুমান করা যাইতে পারে। বর্ষায় মরু ফুটিয়া অঙ্কুর দেখা দেয়—ঊষর ভূমি শ্যামল লতাবিতানে সজীবতার স্নিগ্ধ চিত্রে নেত্র-সমক্ষে প্রতিভাত হয়। নিদারুণ নিদাঘপ্রতপ্ত মরুময় বিপুল মাঠ মহাশ্মশানেরই ভীষণ প্রতিচ্ছবি—কিন্তু বর্ষাগমে এই মহাশ্মশান সহসা আবার শ্যামল কোমলাঙ্কুরাস্তৃত হইয়া নয়নরঞ্জন দৃশ্যে পরিণত হয়—বর্ষা যেন নবপ্রাণের—নবজীবনের,—নবোদ্যম সহসা মাঠে ছড়াইয়া দেয়। ব্যাপার—অতি অদ্ভুত—অতীব ঐন্দ্রজালিক।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম সজীব ধর্ম্ম—সজীবতার ধর্ম্ম—রসের ধর্ম্ম। বৈষ্ণব শুষ্কতার পক্ষপাতী নহেন—জীবনকে মরুভূমি করিয়া যাঁহারা পরমতত্ত্বলাভে প্রয়াসী, তাঁহাদের ধর্ম্ম কেমন, বৈষ্ণবেরা তাহা

জানেন না। বৈষ্ণবধর্ম্ম জীবনময় প্রেমময় ও রসময়। তাই বৈষ্ণব শ্যাম-সুন্দরের আনন্দ-বৃন্দাবনের বর্ষা-বৈভবের এত পক্ষপাতী। বর্ষার সজীবতায় প্রাণে নব অনুরাগ আনয়ন করে, নব উদ্যম—নব আশা ও নবভাব জাগাইয়া তোলে। উদ্ভিদে জীবনী শক্তির প্রথম স্ফূর্ত্তি—প্রথম বিকাশ। জীবসৃষ্টির পূর্ব্বে জীবনী শক্তি সর্ব্বপ্রথমে উদ্ভিদেই বুঝি প্রথম দেখা দিয়াছিল। শ্যাম-সুন্দর শ্যামজলধররূপে বসুন্ধরার তাপিত বক্ষঃ সুশীতল সরস ও সুস্নিগ্ধ করিয়াই,—বুঝি তৎপরে ইহাতে উদ্ভিদাঙ্কুরের উদ্গম প্রচার করিয়াছিলেন।

নব মেঘ-সন্দর্শনে শ্রীমতী রাধিকার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি বলবতী হয়—নবমেঘ শ্রীমতীর ভাবরসের উদ্দীপক। মেঘদর্শনে শ্যামের স্ফূর্ত্তি। মেঘের সহিত কবিরা শ্যামের রূপের তুলনা করিয়াছেন; এ তুলনা আরও কতদূর চলিতে পারে। শ্যাম তাপিতের বন্ধু। তিনি নীরসকে সরস করেন, নিরানন্দকে আনন্দ দেন—ঊষর হৃদয়ও নন্দনে পরিণত করেন, শ্যামের লীলায় শ্মশানে জীবন ফুটিয়া উঠে। মেঘের কার্য্যও কতকটা সেইরূপ।

এখন কথা এই যে মেঘের জলের এই উৎপাদিকা শক্তি কোথা হইতে আসিল? মেঘের জলে জীবনের রস কিরূপে সঞ্চারিত হইল, বিজ্ঞান ইহার কোন উত্তর দিতে সমর্থ হইবেন কি? খুব সম্ভবতঃ বর্ত্তমান বিজ্ঞান এখনও এসম্বন্ধে কোনও উত্তর দিতে সাহসী হইবেন না। জীবন কি বস্তু? ইহার উত্তর বিজ্ঞান খুজিয়া পান নাই। ফিজিওলজিষ্টগণ যতই অনুসন্ধান

করিয়াছেন ততই তাঁহারা ক্রমেই অধিকতর অন্ধকারে পতিত হইয়াছেন।*

সুতরাং বৈজ্ঞানিকগণের নিকট এ তত্ত্ব জিজ্ঞাসার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র কেবলই জড়জগৎ লইয়া। তাঁহারা জড়জগৎ হইতেই চিন্ময় জগতের আবির্ভাবতত্ত্ব ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত। কিন্তু তাহাতে চেতনার মীমাংসা হয় না। জীবের আশা নৈরাশ্য হর্ষ-বিষাদের কথা কার্ব্বন্, হাইড্রোজেনজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেনের বিষয়ীভূত নহে— ইহাদের রাসায়নিক মিশ্রণেও সে তত্ত্ব পরিস্ফুট হয় না; সে-রূপ হওয়ায় আশাও দেখা যায় না। ক্যাভেন্ডিস ল্যাবোরেটরীতে বহুকাল অবধি এই অনুসন্ধান চলিতেছে, কিন্তু এখনও তাঁহারা প্রটোপ্লাজমের (Protoplasm) প্রকৃতি বিনির্ণয় করিতে পারেন নাই।

এদেশের এক শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তি, ঋষিগণের আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের কথা শুনিয়াও তাহাতে বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল জড়দেহ হইতেই চৈতন্যের উদয় হয়। চৈতন্য পৃথক্ বস্তু নহে— উহা কার্য্য-বিশেষ, দৈহিক পদার্থের

---

*The multiplicity of facts recorded by physiologists the ingenuity of the experiments, the intricacy of the results— he astonishing amount of light, and the insuperable darkness—produce a mingled effect upon the mind. As observations multiply doubts matiply with them. We are half disposed to ask whether we really know anything on the subject.—Hinton.

মিশ্রণজাত ক্রিয়া-বিশেষ। এই শ্রেণীর বার্হস্পত্য সম্প্রদায়ের পণ্ডিতবর্গ দেহাত্মবাদী বলিয়া অভিহিত হইতেন। ইহাদের এই অসার বাদখণ্ডনের জন্য বেদান্তী, নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিক সম্প্রদায় ভূরি ভূরি তর্কযুক্তির অবতারণা করিয়া গিয়াছেন।

পাশ্চাত্য প্রদেশে এখন এই দেহাত্মাবাদী সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রভাব। জার্ম্মেণীর প্রাচীন বাইওলজীষ্টগণের মধ্যে ভির্খাউ (Virchow) প্রভৃতি জীবনতত্ত্বের অনুসন্ধানের প্রারম্ভে মনে করিয়াছিলেন, দেহ হইতেই চেতনার উদ্ভব হয়, কিন্তু যতই তাঁহারা বৈজ্ঞানি অনুসন্ধানে প্রবীণ হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদের মতি গতি পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। অবশেষে ইহারা স্পষ্টতই স্বীকার করিতে লাগিলেন,—অচেতন দেহ হইতে চেতনার উদ্ভব অসম্ভব। ইহারা ধীরে ধীরে দ্বৈতবাদী হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু জার্ম্মেণীর বৃদ্ধ বাইওলজিষ্ট (Biologist) হিকেল (Heakel) এখনও এই জড়ীয় একত্ববাদ (Materialistic Monsim) পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি বলেন যে "প্রটো-প্লাজমে আমরা আত্ম-চেতনার উপলব্ধি করি, উহা নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, কার্ব্বন্ ও অক্সিজেনেরই মিশ্রণ-বিশেষ। সুতরাং প্রাকৃত জড়ীয় পদার্থ হইতেই চেতনা জন্মে। তবে সেই মিশ্রণের পরিমাণ ও কৌশল এখনও আমাদের অবিদিত।"

কিন্তু ইংলণ্ডের সুপ্রবীণ ফিজিওলজিষ্ট প্রফেসর মাইকেল (Michael Foster) স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন, 'প্রটোপ্লাজম পরি-জ্ঞান কেবল আমাদের যন্ত্রাদির ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণের লভ্য নহে।

মানসিক চক্ষু পরিস্ফুট না হইলে জীবন-তত্ত্বের জ্ঞান লাভ হইবে না।*

ফলতঃ জীবশক্তি শ্রীভগবানেরই শক্তি। শ্রীচরিতামৃতে এই শক্তিই তটস্থাশক্তি নামে অভিহিত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ইহাকেই পরা প্রকৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যথা :—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

বিষ্ণুপুরাণে এই শক্তি "ক্ষেত্রজ্ঞ" নামে পরিচিতা।

ফলতঃ এই জীবশক্তি নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বর্ত্তমান। এই জীবশক্তি সর্ব্বব্যাপিনী। সর্ব্বত্র ইহার উন্মেষ, বিকাশ ও বিবর্দ্ধন পরিলক্ষিত না হইলেও দেশ-কাল-অবস্থাবিশেষে আমরা এই জীবশক্তির প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া থাকি। ইয়োরোপেও এখন কোন কোন পণ্ডিত এই জীবশক্তির সর্ব্ব ব্যাপিত্ব সম্বন্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন।

হার্ব্বাট স্পেন্সার শক্তির একত্ব স্বীকার করিয়াছেন—তিনি বলেন জড়ে ও চেতনায় একই শক্তির লীলা। কিন্তু সেই শক্তি অজ্ঞেয়। ইহারই উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া নেপলসের প্যাথ-

---

* The problems of physiology in the future are largely conserned in arriving, by experiment and inference, by the mind's eye, and not by the body's eye alone assisted as that may be by lenses yet to be introduced, at a Knowledge of the molecular construction of this protean protoplasm of the laws according to which it is built up, and to laws according to which it breaks down.

লজিক্যাল এনাটমীর (Pathological Antomy) প্রফেসর Dr Otto Von Schroen) বলেন ক্রিষ্টাল সমূহের আদি আবির্ভাব, উহাদের জীবভাব এবং উহাদের সার্ব্বজিক প্রসারের পর্য্যালোচনা করিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে জড়পদার্থসমূহে বিভিন্নভাবে একই শক্তি আপন ক্রিয়া প্রকাশ করে। এই শক্তিকে আমরা—জীবশক্তি বলিয়াই অভিহিত করি। জীবনী শক্তির প্রভাবে যে প্রণালীতে ক্রিষ্টালগুলি গঠিত হয়, সেই প্রণালীর পর্য্যালোচনায় এবং ইহাদের আনুসঙ্গিক অন্যান্য ঘটনা-পরম্পরার পর্য্যালোচনায় আমি বাধ্য হইয়া বিশ্বাস করিয়াছি—তাপ আলোক, রাসায়নিকশক্তি, তড়িৎশক্তি ও সংশ্লেষশক্তি প্রভৃতি একমাত্র জীবশক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। *

ইয়োরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণের এপর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়াও অতিশুভ। তাঁহারা ভারতীয় ঋষিগণের ভগবত্তত্ত্বের কিঞ্চিৎ মর্ম্ম অবগত না হওয়া পর্য্যন্ত এই জৈবতত্ত্ব ভালরূপে বুঝিতে পারিবেন না।

বহু সহস্রবৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় ঋষিগণ এই জীবশক্তির প্রকৃত

---

* My researches into the primary origin of crystals, into their vital and later universal states, have convinced me that there is only one force which we call life. I have been compelled to believe, from the way in which life-force shapes the crystals and from all the attendants phenomena, that all other forces—heat, light, chemical force, electricity, cohesion— are but different manifestations of lifeforce.

তথ্য আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এখন বৈজ্ঞানিক যে অদ্বৈত বাদের আলোকে নিখিল তথ্য ব্যাখ্যাত করিতে প্রয়াসী, সেই অদ্বৈত-তত্ত্ব (Monism) ভারতীয় ঋষিগণের বিশুদ্ধ সত্ত্ব-সমুজ্জল পরিষ্কৃত জ্ঞানে সর্ব্বপ্রথমে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

তাঁহার জৈব ও অজৈব (organic and inorganic) এই উভয় তত্ত্বের রহস্য এক কথায় উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন। আমরা বৃহদারণ্যকে এই বিশাল তত্ত্বের এক পরিস্ফুট ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। শ্রীভগবান্ আত্মশক্তিতে এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়া ইহার মধ্যে তিনি অন্তর্য্যামিরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া সর্ব্ববিধ পদার্থকেই যথাবিধরূপে চালিত করিতেছেন—জলে-স্থলে-অনিলে অনলে-আকাশে-পাতালে সর্ব্বত্র তাঁহারই মহীয়সী শক্তির মহতী লীলা। তিনিই অন্তর্য্যামী ও অমৃত।*

এই সিদ্ধান্তই পরম সিদ্ধান্ত। চিৎ—অচিতের কার্য্য করিতেছে; অচিৎ চিৎ উৎপাদনের সহায় হইতেছে,—বিশ্বে আমরা এই যে চিৎ-অচিতের আদান-প্রদান প্রত্যক্ষ করি—বিজ্ঞান যাহার নিয়ম আবিষ্কারে ব্যস্ত, যাহা লইয়া সহস্র সহস্র বাদ-বিবাদের সৃষ্টি—তাহার মূলে এই অন্তর্য্যামী—অমৃত। অন্ন হইতে প্রাণীর

---

* যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরম্। যঃ পৃথিবমন্তরঃ যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ইত্যাদি। যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানো ন বেদ, যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মন্তর্য্যাম মৃতঃ অদৃষ্টোঽদ্রষ্টাশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতোমন্তাঽবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতো নান্যতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যতোঽস্তি শ্রোতা নান্যতোঽস্তি মন্তা নান্যতোঽস্তি বিজ্ঞাতা ইতি। বৃহৎ আরণ্যক ৩ অধ্যায় ৭ ব্রাহ্মণ।

উৎপত্তি। "অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি"—ইহা শ্রীভগবানের উক্তি। অন্ন উদ্ভিদ্। উদ্ভিদ্‌কেও আমরা অচিৎ বলি না—বলিতে পারিব না। উদ্ভিদে চেতনা স্পষ্ট নহে। কিন্তু অন্নের উদ্ভব কোথা হইতে? বলুন, প্রিয় পাঠক! অন্নের উদ্ভব কোথা হইতে?

ইহার উত্তরের জন্য দূর দেশান্তরে যাইতে হইবে না—মানুষের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করিতে হইবে না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্‌ই বলিতেছেন:—

"পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।"

হিতোপদেশও বলেন,—পর্জ্জন্যমেবভূতানামাধারঃ।

তাহা হইলে বুঝা গেল সেই 'বরষার' কথা—সেই পর্জ্জন্যদেবের কথা। বরষার সঞ্জীবতার কথা বলিতে বলিতে অনেক বিষয়ই মনে পড়িতেছে, কিন্তু এ সকলই বহিরঙ্গ হইলেও অপ্রাসঙ্গিক নহে! কেন না সর্ব্বত্রই সেই অন্নময় মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দ-ময়েরই ব্যাপার—বহিরঙ্গ লীলা। বিভিন্নতা কেবল বহিস্তরে ও অন্তস্তরে। বহিস্তরের কথাও বলা চাই—নতুবা ঐশ্বর্য্য জানা যায় না। ঐশ্বর্য্য না জানিলে মাধুর্য্যের আস্বাদ পূর্ণ হয় না। ঐশ্বর্য্যের মধ্য দিয়া মাধুর্য্যে প্রবেশ করিতে পারিলেই সাধকজীবন সার্থক হয়।

এই বাদলের দিনে একা বসিয়া ঐ বনের দিকে তাকাইয়া থাকিতে যত সুখ, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কথা লইয়া তোলাপাড়া করিতে তত প্রীতি হয় না। তাই সকল ছাড়িয়া—সকল ভুলিয়া মন ও নয়ন আজ ঐ শ্যামলকুঞ্জ-পানে উধাও ছুটিয়াছে।

আমার আশা

নীল নভঃস্থলে স্ফুটচন্দ্র তারা
উজলি প্রকাশ পায়।
সুনীল জলধি-তরঙ্গ-কল্লোলে
অনন্ত প্রসারে ধায়॥
শাখিশাখে পাখী কলকণ্ঠে গায়
মধুর মঙ্গল তান।
গন্ধমাখি গায় গন্ধ বহ ধায়
আনন্দে জগৎ প্রাণ॥
উষার কনক কিরণ প্রকাশে
জগতে আনন্দ ছটা।
দশদিকে বহে আনন্দের রোল
নব জীবনের ঘটা॥
তারি মাঝ খানে একাকী এজীব
রবে কি বিষাদে পড়ি;—
তুমি হে নিখিল অমৃত আনন্দ
নন্দ-নন্দন হরি।
মনে করি সাধ,—আনন্দ মূরতি
নয়নে নয়নে রাখি,
আনন্দ জগতে তোমা-সহ যেন
মিলিয়া মিশিয়া থাকি।

শ্রীকালীদাসী দেবী

আনন্দ ধাম

সমুখে আশার আলো
চেয়ে দেখ প্রস্ফুট উজ্জ্বল
পশ্চাতে চেওনা ফিরে,
আগে চল পথ নিরমল।
ভাব মনে,—হাতে কর কাজ
রুদ্ধ কর মুখের দুয়ার;
যতপার, ক'রে যাও কাজ
বহ নিজে অপরের ভার।
ফলভোগে নাহি রেখো সুখ,
কর্ম্মযোগ—নিষ্কাম সাধন;
কর্ম্মযোগ স্বর্গের দুয়ার,
নিয়ে যায় জ্ঞানের সদন।
কর্ম্ম জানে ভক্তির সন্ধান;
প্রীতিভক্তি কর্ম্ম হ'তে পাই;
কর্ম্মপথ ধরি যাও চলে
পাবে ধ্রুব সে অমৃত ঠাঁই।
বামে ডানে না চাহিও ফিরে
সমুখেতে হও অগ্রসর
পাইবে পরম সুখধাম,—
সুন্দর উজ্জ্বল মনোহর।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী

পিরীতি

বাপ্পা,

নিভৃত নিশীথে সমগ্র জগৎ যখন ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িত, তখন নদীর তটে আমার কুটিরের ধারের গাছের তলায় তোমার সহিত নীরবে নীরবে কথা বলিতাম—এই ভাবেই রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত। কখন বা নদীর দিকে চাহিয়া দেখিতাম—কুলু কুলু কল কল রবে কি-জানি কত-কি প্রাণের কথা বলিতে বলিতে আকুল প্রাণে উন্মাদিনীর ন্যায় কুটীর-কানন-প্রান্তবাহিনী প্রবাহিনী উধাও ভাবে ছুটীয়া চলিয়াছে;—সে দৃশ্য কি সুন্দর, সেই তরল গভীরের—উজ্জ্বল মধুরের—সমাবেশ কি মনোহর! কথা বলিতে বলিতে প্রাণের কথা অনুভূতিতে ডুবিয়া যাইত, স্বপ্নময়ী স্মৃতির রাজ্যে চলিয়া পড়িতাম; তখন তুমি আমাকে জাগাইয়া তুলিয়া কখন বা ফুল্লকুসুম-বিনিন্দিত অগণ্য নক্ষত্রমালাখচিত নীলনভঃস্থলের অধিবাসীদিগের তত্ত্ব জানিবার জন্য শত প্রশ্ন উত্থাপন করিতে; আর তোমার চিত্তবিনোদনের জন্য আমি কখন বা Astro-anthropology কখন বা Astropsychology আবার কখনও বা Astrophysics তত্ত্বের কথা বলিয়া তোমায় সুখী করিতে প্রয়াস পাইতাম। বাপ্পা—তখন সেই এক দিন ছিল, যখন আকাশ-পৃথিবী-পাতালের কথা ভাবিতাম; ভাবিতে ভালবাসিতাম, তোমায় বলিতাম, বলিতেও ভালবাসিতাম। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই—জানত বাপ্পা, চিরদিন কাহারও সমান

যায় না। এখন আর বাহিরের খটখটি ভাল লাগে না। এমন দিন ছিল যখন সকল প্রকার-logyরই একটা আকর্ষণ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতাম। এখনও এ সকলের আকর্ষণ একবারেই কাটিয়া উঠিতে পারি নাই। এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটি কেবল অনন্ত-ঘটনায় পূর্ণ;—অনন্ত ব্যাপারের অনন্ত আকর্ষণ। আমার অনন্তমুখী প্রতিভা সব বুঝিতে চায়—সব জানিতে চায়—কিন্তু জানিতে গিয়া অজানা রাজ্যের পরিধিটা ক্রমেই বাড়িয়া যায়—Knowable সসীম, Unknowable অসীম। জানিবার ইচ্ছা কাহার না হয়—কিন্তু মানুষ কি কেবল চিরদিনই জানিবার জন্য ব্যাকুল থাকিতে পারে? তাহার প্রাণে কি আস্বাদনের আশা জাগে না—আর যদি জাগে তাহা কি অস্বাভাবিক? আর সেই জানারই বা পরিণতি কোথায়? যেমন জ্ঞান চাই, তেমনি ভোগও তো চাই। ভোগ ভিন্ন—আস্বাদন ভিন্ন মানুষের আত্মা সরস সুন্দর সজীব ও সম্পুষ্ট থাকিতে পারে কি? তাই আজ তোমার নিকট একটা নূতন কথা বলিতে চাই, আজ তোমার নিকট 'পিরীতি" তত্ত্ব বলিব।

তুমি দর্শন বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতে ভালবাস। ভগবদ্গীতা তোমার প্রিয় জিনিষ; কিন্তু প্রেমগীতা কি;—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলী না পড়িলে তুমি এই প্রস্তাব বুঝিতে পারিবে না। আমি "প্রীতি" না বলিয়া, "পিরীতি" বলিলাম। তুমি হয় ত ইহাতে মনে করিবে, "পিরীতি"টি যখন "প্রীতি" শব্দের অপভ্রংস, তখন প্রীতি না বলিয়া গ্রাম্যশব্দ "পিরীতি" বলা হইল কেন? পিরীতি বলিলাম কেন, বাপু, তাহা যদি

বুঝিতে পারিবে, তবে আর কঠোর কঠোপনিষদে তুমি রস নিঙড়াইতে বসিবে কেন, অথবা মাণ্ডুক্যকারিকা লইয়াই বা মাথা ঘামাইবে কেন?

তোমাকে স্পষ্টতঃ বলিতেছি, "প্রীতি" আর "পিরীতি এক জিনিস নহে। প্রীতি কঠোর ও পণ্ডিত। পিরীতি কোমলা ও আহীরী ব্রজবালা; প্রীতি পাণিনির ব্যাকরণ অথবা ব্যাসদেবের শ্রীমদ্ভাগবত। আর পিরীতি চণ্ডীদাসের পদাবলী। প্রীতি বলিলে যে ভাবের উদয় হয়, পিরীতি বলিলে সে ভাবের উদয় না হইয়া অন্য কথা মনে হয়। রামের সহিত শ্যামের প্রীতি কি সদ্ভাব জন্মিতে পারে, কিন্তু "পিরীতি" হইতে পারে না। "পিরীতি" এক স্বতন্ত্র পদার্থ। প্রেম যদি পঞ্চম পুরুষার্থ হয়, পিরীতি তবে ষষ্ট পুরুষার্থ। বলিতে কি পিরীতি শ্রীমদ্ভাগবতেরও অগোচর। বাপু, পিরীতি আর প্রেম এক পদার্থ নহে—পিরীতি চণ্ডীদাসের হৃদয়-নিহিত এক মহাভাব। এ ভাব বেদে নাই, উপনিষদে নাই, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নাই, এমন কি শ্রীমদ্ভাগবতেও নাই। তোমরা যাহাই বল, আর, যতই বুঝাও, পিরীতি আর প্রীতি যে একই পদার্থ, তাহা আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিব না। তোমরা "প্রীত্যর্থে" প্রীতি শব্দের প্রয়োগ কর, হয়ত অজীর্ণ বা অরুচি রোগে আহার তোমাদের "প্রীতি" থাকে না, কিন্তু সে সব স্থলে "পিরীতি বসিবে না। "পিরীতি"র জন্য কেবল এক স্থান; পিরীতির কেবল এক ব্যবহার—এক প্রয়োগ। প্রীতি বেদান্ত। প্রীতি সকলকেই এক করিতে চাহে—সকলকেই আপনার মধ্যে

আনিতে চাহে। কিন্তু আমার "পিরীতি" সেরূপ নহে। পিরীতি সাংখ্য। সাংখ্যের পুরুষের ন্যায় পিরীতি একগুঁয়ে, পিরীতি উদারতা জানে না, বিশ্বপ্রেম বা universal love বুঝে না,— কেবল বুঝে নির্জ্জন, কেবল বুঝে কুঞ্জকুটীর—কেবল বুঝে কালিন্দীর তীর, কেবল বুঝে ভাণ্ডীর বন—তাহার লক্ষ্য—কেবল সেই একরূপ। সেই—

শ্যামল সুন্দর বিশ্ব মনোহর
উজ্জ্বল নটবর বেশম্।

পিরীতি ব্যাকুলতা—পিরীতি উদাসিনী—পিরীতি যোগিনী, পিরীতি অনুরাগিণী, অনুরাগে উন্মাদিনী,—অনুরাগে অনুরাগে জীবন্মৃতা। আরও কত কিছু বলিতে পারি। কিন্তু ইহা কি বলিবার কথা! কে কবে মানুষের ভাষায় পিরীতির কথা বুঝাইয়া প্রকাশ করিতে পারে? বেদান্তের মায়া অনির্ব্বচনীয়া; অস্ফুটতায় পিরীতি তাহা অপেক্ষা কম কিসে? বাঞ্ছা, আমি তোমাকে আমার ভাষায় পিরীতি বুঝাইতে পারিব না। ঠাকুর চণ্ডীদাস কি বলেন, শুন;—তুমি বেদান্তসূত্র পড়িবার বেলায় "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" পড়িয়াছ। এখন একবার "পিরীতি-সূত্র" পড়।

বেদান্ত সূত্রের ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার ন্যায় বলা যাইতে পারে অথাতো পিরীতি-জিজ্ঞাসা"।

"তারপরে—সুতরাং পিরীতি-জিজ্ঞাসা।"

"পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
সৃজিল কোন বা ধাতা;

অবধি জানিতে সুধাই কাহাকে
ঘুচাই মনের ব্যথা ॥"

বেদান্ত-সূত্রের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার ন্যায় এই "পিরীতি-জিজ্ঞাসা"র সূত্রপাত হইল। বেদান্ত-সূত্রের "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা"র অনুকরণে এস্থলে "তারপরে—সুতরাং পিরীতি-জিজ্ঞাসা' এইরূপে সূত্রের অবতারণা করিতে পারি। কর্ম্মকাণ্ড সমাপনান্তর যেমন জ্ঞানকাণ্ডে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভক্তিভাবাদির পরেই পিরীতি-কথার সূত্রপাত হয়, যথা শাস্ত্র :—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততোনিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততোভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

অগ্রে শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ, তৎপরে ভজন-ক্রিয়া, তদনন্তর অনর্থনিবৃত্তি, তারপরে নিষ্ঠা,অতঃপর গুণলীলাদি শ্রবণে অভিলাষ, অনন্তর আসক্তি, তৎপর শুদ্ধভাব, ইহার পরেই প্রেমের উদয়। ইহা শাস্ত্রীয় ক্রম। আমারা বলিব এই প্রেমের পরেই "পিরীতি"।

বেদান্তের ২য় সূত্র—"জন্মাদ্যস্য যতঃ।"

অর্থাৎ যাহা হইতে এই বিশ্বের জন্মাদি হইয়া থাকে। পিরীতি -দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রটা বলিতেছি :—

"এই মোর মনে হয় রাত্রি দিনে
ইহা বহি নাহি আর।

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
এ তিন ভুবন-সার ॥”

বাপু, এবার একবার বেশ করিয়া মিলাইয়া পড় দেখি? বেদান্ত-সূত্র ও পিরীতি-সূত্রের কোনরূপ সাম্য-সামঞ্জস্য দেখিতে পাও কি না? বেদান্ত-সূত্র বলিতেছেন, এই ব্রহ্ম হইতেই এই বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। শ্রুতি বলেন:—

“ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।”

অর্থাৎ এই জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। পিরীতি দর্শনেরও সেই কথা—পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর এ তিন ভুবন সার। ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই। বুঝিলে ত,—পিরীতি-দর্শন দার্শনিক প্রণালীবিহীন নহে। সুতরাং এখন আর কটকটঃ ঘটোঘটঃ করিয়া কাজ নাই। একবার সূত্রগুলি শুনিয়া যাও, ব্যাখ্যা আবশ্যক হইলে, পাছে হইবে। এই শুনঃ—

“বিহি এক চিতে ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল পি।
রসের সাগর মন্থন করিতে
তাতে উপজিল রী ॥
পুন যে মথিয়া অমিয়া হইল
তাহে ভিয়াইল তি।
সকল সুখের এ তিন আখর
তুলনা দিব যে কি ॥

যাহার মরমে পশিল যতনে
এ তিন আখর সার।
ধরম করম সরম ভরম
কিবা জাতি কুল তার॥

এই তিন আখর যার মরমে প্রবেশ করে, সে ধরম করম, সরম ভরম, এবং জাতি কুল ইহার কিছুরই ধার ধারে না, ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য, সুখদুখ, জীবন মরণ, তাহার নিকট এ সকলই তখন নষ্ট হইয়া যায়। তাই চণ্ডীদাস বলিতেছেনঃ—

"শ্যামের পিরীতি হৃদয়ে পশিল
তার কি পরাণ রয়।
পরাণের মাঝে পিরীতি পুষিলে
কে তারে জীয়ন্ত কয়॥"

চণ্ডীদাসের লেখায় শ্রীরাধা বলিতেছেন "বঁধু হে, তুহুঁ মম মরণ সমান। এখানে সুখ দুঃখ আশা ভয়—সকল ভাবেরই নির্ব্বাসন,—একি এক মহাগম্ভীর ভাব-সমাধি!

বাপ্পা, বুঝিতে পারিলে কি? তোমার এই সংসারের আশা ভয় বাসনা বা তৃষ্ণা, পিরীতিমগ্ন হৃদয়কে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে পারে না। পিরীতি হৃদয়কে অবশ করিয়া দেয়। দিনযায়, রাত্রি হয়, রাত্রির পরে আবার দিন হয়, পিরীতি-মগ্ন হৃদয়ের নিকট দিবারাত্রির ভেদ নাই, আলোক-অন্ধকারের জ্ঞান নাই, সুখ দুঃখের বোধ নাই। এমন মাদকতা আর কাহারও নাই, এমন

প্রভাব আর কিছুতেই নাই। পিরীতির এমনই রীতি যে প্রাণ গেলেও পিরীতি যায় না।

"পিরীতি পিরীতি কি রীতি মূরতি
হৃদয়ে লাগিল সে।
পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে
পিরীতি গড়লে কে॥"

পিরীতি নিত্য। যদি ভাগ্যফলে কাহারও হৃদয় পিরীতিতে মজিয়া যায়, তবে পিরীতি আপন প্রভাবে সে হৃদয়কে নিত্য-পিরীতির আধার করিয়া তোলে। প্রাণ গেলেও সে হৃদয় পিরীতি-ছাড়া হয় না।

শ্রীমতীর হৃদয়ে যখন শ্যামানুরাগের উদয় হইল, শ্যামের পিরীতি যখন তাঁহার হৃদয় আকুল করিয়া তুলিল, তখন তাঁহার যে অবস্থা হইয়াছিল, চণ্ডীদাস এইভাবে তাহার কতকটা আভাস দিয়াছেন—

"শ্যামের পিরীতি আরতি বাড়াঞা
মরণ অধিক কাজে
লোক চরচায় কুলের খাঁখায়
জগত ভরিল লাজে॥
হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মনু।
কহিতে কহিতে তনু জর‌জর
পাগলী হইয়া গেনু॥"

যদি চণ্ডীদাসের উদয় না হইত, তবে বুঝিবা এ জগতে পিরীতির ভাষা একেবারেই অস্ফুট রহিয়া যাইত। পিরীতির এই তীব্র ব্যাকুলতা চণ্ডীদাস স্থানে স্থানে যেরূপ ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন এবং তাহার স্তরে স্তরে পিরীতির যে সকল অব্যক্ত অস্ফুট, অথচ তীব্র ব্যাকুলতাপূর্ণ কলকাকলী প্রেমিক ভাবুকগণের মানসশ্রবণে ক্ষণে ক্ষণে পরিশ্রুত হইয়া থাকে, তাহা আমরা আমাদের এই মানবীয় ভাষায় কিছুতেই অভিব্যক্ত করিয়া উঠিতে পারিব না। আমরা সংসারের সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে বাস করিয়া—মানব-সমাজের নিত্য ব্যাবহারিক সাংসারিক ভাব ও ভাষা লইয়া পিরীতি-তত্ত্ব বুঝাইতে পারিব না।

"ধরম করম লোক চরচাতে
একথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আখর যাহার মরমে
সেই সে বুঝিতে পারে॥"

যাঁহারা এই তিন আখর হৃদয়ে লইয়া যোগীর মত ধ্যানমগ্ন হন, তাঁহারই ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। আমরা ইহার দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের সম্বন্ধে দর্শন বিজ্ঞান লইয়া যতই কেন আলোচনা করিনা তাহাতে ইহার কিছুই বুঝিতে পারিব না। বাপ্পা! চণ্ডীদাসের এই পিরীতি-তত্ত্ব কপিলে নাই, ক্যাণ্টে নাই, গৌতম-সূত্রে নাই, মিল-বেন্থামে নাই, পুরাণে নাই, ইতিহাসেও নাই। শ্রীভাগবতে ইহার ভাবচ্ছায়া পাইতে পার, সেখানেও সম্পূর্ণ ভাব আদায় করিতে

পারিবে না। জয়দেব ও বিদ্যাপতি অনুসন্ধানের স্থল বটে, কিন্তু সেখানেও ষোল আনা মিলিবে না। শ্রীচণ্ডীদাসই এই তত্ত্বের একমাত্র উদ্ভাবয়িতা, শ্রীরাধা ইহার একমাত্র আশ্রয় এবং মদনমোহন বংশীবদন শ্রীশ্যামসুন্দরই ইহার একমাত্র বিষয়। বাপ্পা আমি তোমাকে শুনা কথা শুনাইলাম।

বাপ্পা! যদি বুঝিতে পারিয়া থাক, তবে জানিও ইহাই পিরীতি। যদি আরও বুঝিতে চাও, তবে শ্রাবণ মাসের রাত্রি-কালে "রিমিঝিমি বরিখনে'র সময় নীরব নিশায় নিভৃতে বসিয়া "জয়রাধে শ্রীরাধে" বলিয়া বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলী পড়িও। প্রসাদদাসের পদে তোমার রুচি হইবে কি? একটী পদ তোমায় উপহার দিতেছি :—

"শায়ন সজল জলদ ঘন ঘোষত,
গর গর নাদ গভীর।
যামিনী গভরে, তিমির পরিপূরল
বরিখত ঝর ঝর নীর॥
শিখিকুল কবহুঁ, কেকা রব গাওত
ঝিঁঝা ঝিনিকি ঝন রাব।
নীরদ নীর, পরশ মত দাদুরি
কুদত পুণ উছলাব॥
গোপল তারক অম্বর কোর।
শীতল সুখকর সময় বিহারত
পুরজনে নিন্দক ঘোর॥

ক্ষিতিরুহ পত্র পরশি ঝরু শীকর
জাগত নয়ন চকোর।
পরসাদ দাসক, চিত কব জাগব
করব যুগল পদসেবা॥"

বাপ্পা! বলিতে গিয়া সকল কথা বলিতে পারি না, লেখনীর মুখেও সকল কথা ফোটে না। এ দোষ কি আমার, না সৃষ্টির? ভাষা ভাবের দাসী। তবে ভাবের অভিপ্রায় ভাষা যোগায় না কেন? কেন, এ প্রশ্নের উত্তর অনেক প্রকার হইতে পারে। কিন্তু আমি বুঝিয়াছি, মানুষের ভাব অপূর্ণ, ভাষা তা অপেক্ষাও অধিক অসম্পূর্ণ। তাই ভাষা অনেকস্থলেই নীরব। আমরা নিজের হৃদয়ে যাহা আস্বাদন করি, সে আস্বাদন অন্যকে বলিতে চাই, জানাইতে চাই, বুঝাইতে চাই, কিন্তু পারি না, বুকে ভাব খেলিয়া উঠে, কিন্তু মুখে ফোটে না। জানত বাপ্পা, এ সকলি সেই 'মূকাস্বাদনবৎ"। পিরীতির কথা বলিতে পারিলাম না। যাহা বলিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই বলা হইল না। কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ ইঁহারা মহাকবি। কিন্তু প্রেমের কথা বলিতে গিয়া ইঁহাদেরও ভাষা হার মানিয়াছে, শতাংশের একাংশ হয়ত ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে, আর বাকী সকল অংশই সহৃদয় পাঠকগণের হৃদয়ে ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়া ভাষা নীরব হইয়াছে। এই সকল কবিদিগের এই অংশগুলিই নাকি শ্রেষ্ঠ কাব্য—অর্থাৎ কাব্যের ভাষা যেখানে নীরব—সেই অংশই নাকি শ্রেষ্ঠ।

বাপ্পা! তুমি হয়ত মনে করিতেছ এ এক প্রহেলিকা—

প্রহেলিকা নিশ্চয়ই নয়—অতি সত্য। ইহারই নাম ব্যঞ্জনা—Suggestiveness.

কিন্তু পিরীতি-কাব্যে ব্যঞ্জনারও বড় বেশী প্রবেশাধিকার নাই, তবে বল, কেমন করিয়া তোমায় পিরীতির কথা বলিব?

পিরীতির পথ খুঁজিতে যাইয়া ভোলানাথ সকল হারাইলেন, শ্মশানবাসী হইলেন, ভাবের তুফানে তাণ্ডব নৃত্য ধরিলেন, পঞ্চানন পঞ্চমুখে বলিতে যাইয়াও কিছু বলিতে পারিলেন না।

প্রিয় বান্ধা, আমার মনের কথাটি তোমায় বলিব কি? আমার যেন মনে হয়, শ্মশানই বুঝি পিরীতি-তত্বস্থানের প্রথম পাঠশালা। তাই বুঝি প্রেমপাগল ভোলানাথ শ্মশানকে এত ভালবাসেন। লোকে আগুনকে পবিত্র বলে, কিন্তু শ্মশানের আগুন কি ভীষণ রাক্ষস! মানুষের শোণিত, মানুষের মাংস, মানুষের হাড়—ইহাই উহার খাদ্য। তাই বেদ "ক্রব্যাদ" নামে উহার পরিচয় দিয়াছেন। "ক্রব্যাদ" নাম শুনিয়া ভয় করিও না, ঘৃণা করিও না, কেন না শ্মশানই প্রেমগুরু পঞ্চাননের প্রিয়-নিকেতন।

যদি পিরীতির কথা শুনিতে চাও, তা' হইলে ঐ ক্রব্যাদের পাশে কুটীর বাঁধিবে; পার যদি দেখিও জগতের স্বার্থের পরিণাম কোথায়? ভোগেরই বা পরিণাম কোথায়? যে আসিল, সে কোথায় গেল? সে কার সন্ধানে আসিয়াছিল এবং কি লইয়াই বা ফিরিয়া গেল? যেখানে স্বার্থ, সেখানে প্রেম নাই, তোমার প্রাসাদপূর্ণ সহরের হাটেবাজারে অলিগলিতে প্রেমের কোনও

খবর পাইবে না। যেজন সুখ সুবিধা চায়, সে প্রেম জানে না, যে দুঃখকে ভয় করে সে প্রেম পায় না। প্রেম,—সুখ দুঃখের অতীত।

"বন্ধুর লাগিয়া যোগিনী হইব
কুণ্ডল পরিব কাণে।
যাবে দেশে দেশে বন্ধুর উদ্দেশে
সুধাইব জনে জনে॥
বঁধুয়া কোথা বা আছ গো—"

ইহা পিরীতিরই ভাষা। এখানে সুখ নাই, দুঃখ নাই, পাপ নাই, পুণ্য নাই, ঘৃণা নাই, লজ্জা নাই, ভয় নাই, ভরসাও নাই—এই ভাবটা প্রকৃত পক্ষেই সর্ব্বধর্ম্মের সমাধি—সর্ব্বস্বার্থের মহা-শ্মশান। এখানে ঐ সকল সংসার ব্যাপার পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে—আছে কেবল অনিদ্র, অফুরন্ত তীব্র অনুরাগ। সে অনুরাগ বুদ্ধিহীন, বিচারহীন অথচ দুর্নিবার।

"নবীন পাউসের মীন মরণ না জানে।
কানু অনুরাগে চিত ধৈরজ না মানে॥"

বলিয়াছি ত, পিরীতির কথা তোমায় বুঝাইতে পারিব না; কিন্তু আর একটি কথা বলিব, জানিও ইহাই আমার শেষ—

"শ্যাম রে, তুঁহু মোর মরণ সমান,
লাখ সুখ দুখ চিতে কভু না গণিলুঁ
চরণ পরশি অগেয়ান॥"

তোমার পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাহাকে consciousness বলেন, আর এদেশের দার্শনিকগণ যাহাকে "সংবিদ" বলেন,

উক্ত পদের ভাবরাজ্যে তাহারই চিরসমাধি। এই কারণেই বুঝি আমার হৃদয়-সখা কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন :—

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম
সেই প্রেম নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হলে কেহ না জীয়য়।"

হরি! হরি! কোথাকার কথা কোথায়, সব এলোমেলো, সব যেন উলট পালট, কাজেই এইখানেই 'ইতি'।

তোমারই চিরদিনের সেই
সেবারাম

দাও গো বলিয়ে।

ভেঙ্গে গেল সংসারের সুখের স্বপন;
এখন কোথায় আমি? একি সেই গৃহ?
সেই রাজপথ, একি সম্মুখে আমার?
একি পথ? যাব কোথা? কোথা মোর ঘর?
কি করিব? যাব কোথা? থাকি বা কোথায়?
কিছুই বুঝিতে নারি—চৌদিকে আঁধার!
লক্ষ্যহীন শান্তিহীন শক্তিহীন হ'য়ে,
কেমনে কাটিব কাল দাও গো বলিয়ে,
যদি কেহ থাক কোথা ভাবের ঈশ্বর।

শ্রীদময়ন্তী দেবী।

আবার তুমি

আমি চিরদিন তোমায় ভুলিয়া থাকি, কিন্তু তুমি আমায় ভুলিতে দাও না। একি তোমার দয়া, বা অত্যাচার,—বুঝিতে পারি না। আমি এজগতের ধনজন লইয়া—জগতের লাভপূজা প্রতিষ্ঠা লইয়া বিভোর থাকি, ভুলিয়াও তোমায় মনে করি না। কিন্তু তুমি এমনই চতুর,—যে আড়াল হইতে সহসা আসিয়া আমার চখের সম্মুখে উপস্থিত হও,—এমন ভাবেই দাঁড়াও যে তোমাকে দেখিয়া আমি ভীতভীতবৎ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াই—সম্মুখে বিপদের সমুদ্রতরঙ্গ সৃষ্টি কর—ঘোর ঘনঘটার তুফান—ভীষণ বিঘোর আঁধার—সেই তরঙ্গাভিঘাতে, সেই ঘোর ঘনঘটাসমাচ্ছন্ন নিবীড় আঁধারে কোনও সহায় দেখিতে পাই না—নিঃসহায় শান্তিহীন বিপম্ভাবনায় বিষন্ন ও অবসন্ন হইয়া পরি। আমার সমক্ষে এই বিপুল বিকট ইন্দ্রজাল বিক্ষেপ করিয়া আমার সাংসারিক সুখশান্তি অপহরণ করিয়া তুমি ভীষণ বিকটবেশে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও, কত ভয় প্রদর্শন কর, শত ছলনায় কত বিড়ম্বিত কর—এই ভাবে আমায় একবারে নাজেহাল নাস্তানাবুদ করিয়া অবশেষে মধুর বেশে স্মিতসুন্দর প্রফুল্লাননে আদরপূর্ণ মধুর নয়নে আমার চিবুকে আপন কোমল করস্পর্শে আমায় কত সান্ত্বনা দাও। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে তোমায় দেখিয়া বিষাদের নয়ন-জল বিন্দুমাত্র না শুখাইতেই তোমায় পাইয়া আনন্দে বিভোর হই।

যদি এতই ভালবাস, যদি এ পথের ধূলার প্রতি তোমার এতই টান—তবে একবারে চরণতলে টানিয়া না লও কেন—এত ভ্রান্তি

বিভ্রান্তিতে এখানে ভুলাইয়া রাখ কেন? এত বিস্মৃতি বিড়ম্বনা কেন, এত ছলনা লাঞ্ছনা কেন?

সাধ্বীর আদর চিরদিনই আছে। কিন্তু কুলটার আদর কৈ? এ জগতে কুলটা-কলঙ্কিনীর আদর করিতে কেবল তুমিই জান। আমি তোমায় ছাড়িয়া অনন্ত ভূতের আশ্রয় লইয়া ইন্দ্রিয় প্রীতিতে বিভোর রহিয়াছি। ঘোরতর মোহ-মদিরায় বিঘোর বিস্মৃতিতে দিনযামিনী অতিবাহিত করিতেছি।

তুমি বজ্রবেদনায় যখন আমায় জাগাইয়া তোল,—ভীম ভয়ঙ্কর রূপে ভীতি প্রদর্শন করিতে করিতে যখন অনন্ত বিপদের বেশে আমার নয়ন-সমক্ষে আত্মপ্রকাশ কর, তখন মনে হয়,—একি অত্যাচার—একি বিশ্ববিপ্লাবী ভীষণ তুফান—একি মহাপ্রলয়ের বিপুল উদ্যম,—নয়নসমক্ষে অনন্ত অজস্র অমিশ্র আঁধারের বিরাট্ লীলা! ভীতভীত ভাবে ভীতি-সঙ্কুচিত আত্মা কোথায় আশ্রয় পাইবে তজ্জন্য ব্যাকুল হয়—সেই ব্যাকুলতার মধ্যে,—চিত্তের সেই তুর্ব্বিসহ অন্ধকারে,—সহসা তোমার স্নিগ্ধমধুর নখদ্যুতির স্মিতসুধা-পূর্ণ কিরণচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়—দেখিতে দেখিতে,—হে চিরসুন্দর তোমার প্রেমোজ্জ্বল প্রসন্ন মূর্ত্তি-সন্দর্শনে আমার সমস্ত বিভীষিকা বিদূরিত হয়—বিষাদ সাগরে আনন্দতরঙ্গ নাচিয়া উঠে।

তোমার এ কুহক-যবনিকা—তোমার এ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী দুরন্ত মায়ার আবরণী লইয়া এ লীলা-বিহারে তোমার যে কি অভিসন্ধান, তাহা তুমিই জান—কিন্তু আমার পক্ষে বিড়ম্বনার একশেষ।

তোমাকেই চাই।

দয়াল ঠাকুর, তোমার এ জগতের লোক ভোগ চায়, সম্পদ বৈভব চায়। সুখ-বিলাস-লালায়িত চিত্ত ভোগবিলাসের কত জিনিস চায়,—তুমি তাহাদিগকে সে সকল দিতে চাও, দাও,—আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। আমি উত্তেজনাময় সুখ সম্পদে বিন্দুমাত্রও শান্তি পাই না। আমার সুখ,—বনে আর মনে।

মনটী যখন আমার হয়, মনটী যখন বাহির হইতে ফিরিয়া আসে—আপন ঘরে বসে, স্বস্থ হইয়া তোমার চরণের দিকে তাকায়—তখন আমার যে আনন্দ—সে আনন্দের তুলনা নাই—কেমন শান্ত, সুন্দর ও সুমধুর! ঐটী আমার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগে। আমি যথার্থ কথাই বলিতেছি। তাহা হইলে বুঝা গেল আমি প্রাণে প্রাণে তোলাকেই চাই—কেবল তোমাকেই চাই।

অভাব,—পার্থিব জগতের হিসাবে অভাব আমার অনন্ত। সেই সকল অভাবের মধ্যে বাস করিয়া অভাব নিরাকরণের জন্য নানা কাজে ব্যস্ত থাকি—দায়ে পড়িয়া অনন্ত যাতনার বোঝা মাথায় লইয়া, দিন যামিনী অতিবাহিত করি। এইরূপেই দিন রাত চলিয়া যায়। তোমাকে লইয়া দুই দণ্ড বসিব, তোমার কথা ভাবিব, সে সময় হয় না—কিন্তু ইহা নিশ্চয়, যাহা যাহা লইয়া দিবানিশি ব্যাকুল থাকি সে সকলের সহিত চিত্তের কোনও সম্বন্ধ-সংস্রব নাই, প্রীতি অনুরক্তি নাই—উহাদের প্রতি অনুরাগ

আকর্ষণ নাই, কেবল দায়ে পড়িয়া উহাদের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছি। এ দায়ও তোমারি দেওয়া দায়। আমি জানি আমার নিজের কোনও শক্তি সামর্থ্য নাই।

এত দায়ের মধ্যে থাকিয়াও মনে হয়, প্রাণের সখা তোমাকে পাইলে এ জঞ্জাল—এত যাতনা সহজেই ভুলিতে পারি। কেবল তোমার মুখের দিকে চাহিয়াই তো তোমার সংসারে রহিয়াছি। দুঃখ এই যে, তোমার সংসারকে মধুময় ভাবে দেখিতে পারিলাম না, তোমার সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া মধুরতর করিয়া এ সংসার দেখা হইল না। সাধুরা ত সেইরূপই দেখেন, কিন্তু আমার নিকট এ সংসার এখনও জঞ্জালময়—ঝঞ্ঝাটময়!

বুঝিতে পারি, এরূপ ভাবা অন্যায়—বুঝিতে পারি—এরূপভাবে সংসার দেখিলে তোমায় সম্যক্‌রূপে দেখা হয় না। সংসারেও তোমার শান্তি, তোমার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য—তোমারই প্রেমানন্দ রসলহরী প্রত্যক্ষ করিয়া তোমার চরণের দিকে তাকাইতে হইবে, তোমার চরণারবিন্দের আনন্দ-মাধুরীতে চিত্ত পরিষিক্ত করিয়া নয়ন সমুজ্জ্বল করিয়া এ জগতের দিকে তাকাইতে হইবে, তাহা হইলেই সর্ব্বত্র তোমার দর্শন হয়,—বেদ বেদান্ত তন্ত্রমন্ত্রের সহিত আমার মন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া তোমায় চিনিতে পারে, তোমায় বুঝিতে পারে,—ডাকিতে পারে ধরিতে পারে।

কিন্তু সত্য সত্যই তোমায় বলিতেছি, সেটি হয় নাই। এখানকার রাজত্ব আমি চাই না, পুত্র কলত্র আপন পর প্রভৃতি কাহারও সহিত আমি ক্ষুদ্র সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে চাই

না। আমি জগতের সহিত সঙ্কীর্ণ সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া যদি তোমারই জগৎ বলিয়া তোমার জগতের সেবা করিতে পারি, তোমারই সম্পর্কে জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া জগৎকে আপন ভাবিতে পারি, সেবা করিতে পারি তাহা ভাল মনে করি। তখন কোন ঝঞ্ঝাট থাকে না, কিন্তু তাহা হইতেছে না—'অহং' 'মম' ঘোল আনাই রহিয়াছে। তাহার সাথে সাথে ঝঞ্ঝাট থাকা অনিবার্য্য—কাজেই আমার মূলেই গোল রহিয়াছে।

তাই এখন আদৌ তোমাকেই চাই; জানি তুমি আমার,—আমার ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়—প্রাণের প্রাণ—আত্মার আত্মা। জগৎ যখন ঘুমাইয়া যায়—কেহ যখন আমার সময়ের উপরে আর দাবি রাখে না, তখন তোমার জন্যই আমার প্রাণ কাঁদে—তখন প্রাণ তোমাকেই চায়—তাহাতেই বুঝিতে পারি—এই বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কেবল তুমিই আমার। হে আমার প্রাণের দেবতা—আমার আত্মার নিত্য সাধের ধন, কাঙ্গালের ঠাকুর—কবে দিবানিশি তুমি আমার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবে?

ব্রতের সংযম

যারা জীবনের ব্রত সাধে,—
তারা তারল্য চাপল্য বাক্যের বিলাস
দীনতা নীচতা ব্যঙ্গ উপহাস,
কথায় করমে লঘুতা প্রকাশ
ত্যজিয়ে হৃদয় বাঁধে।

হৃদয়ের বাঁধ,—শৌর্য্য ধৈর্য্য
মুখে নাহি কথা কেবলি কার্য্য
সংযমে রাখে প্রাণের ঐশ্বর্য্য,
উচ্ছ্বাস-গতি রোধে ;
ভাবের সংযম, ভাষার সংযম
অনন্ত চিন্তায় বাঁধা থাকে ক্রম ;
দিবানিশি তারা করে কত শ্রম,—
জগতের ধার শোধে ;
চায়না তাহারা কভু যশোমান
গায়না তাহারা স্তাবকের গান
আপনার ভাবে মাতাইয়া প্রাণ
নাহি মজে অনুরোধে ;
না করে তাহারা বহুল বুদ্ধি,
ভাবে দিবানিশি আপনা সিদ্ধি ;
খোজেনা তাহারা অপর বুদ্ধি,
স্পর্দ্ধিত নহে ক্রোধে।
একই লক্ষ্য সম্মুখে রাখি
একই ভাব অন্তরে মাখি
একই দৃশ্যে রাখি সদা আঁখি
রহে সদা এক বোধে।
ইহারাই জানে ব্রতের নিয়ম
ইহারাই জানে ব্রতের সংযম
ইহাদেরি ভবে সার্থক জীবন
এরা সাধনে সিদ্ধি সাধে।

শ্রীকালীদাসী দেবী

রথযাত্রা।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা হিন্দুগণের পর্ব্বের অন্যতম। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যখন পুরীধামে প্রকট ছিলেন, তখন মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহাসমারোহে রথযাত্রা সম্পন্ন করিতেন। তখনকার উৎসব এক বিপুল বিশাল ব্যাপার। বঙ্গের ভক্তগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা সন্দর্শনের জন্য প্রতিবর্ষেই শ্রীধামে উপনীত হইতেন। এই উপলক্ষে ভক্ত-সম্মিলন হইত। গৌড়ীয়-ভক্তগণ মুক্তি-কামনায় রথে বামন-দর্শন-ফললাভের আশা রাখিতেন না। রথে বিষ্ণু দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না, এই আশা হৃদয়ে পুষিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তগণ পুরীধামে যাইতেন না। তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকিত—বৎসরান্তে একবার তাঁহাদের প্রাণের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের চরণ-সন্দর্শন করা—রথযাত্রা সন্দর্শন উহারই আনুসঙ্গিক—কিন্তু তাহাতে অপরাপর কামনা থাকিত না। পুনর্জ্জন্ম না হওয়ার অর্থ তাঁহারা বুঝিতেন বিষয়-কামনাপূর্ণ জীবনের পুনর্ব্বার উদয় না হওয়া। কিন্তু সমাজ-ধর্ম্মের উপদেশবাণী স্মরণ করিয়াই বহুসংখ্যক ভক্ত রথযাত্রায় পুরীধামে গমন করিতেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেও বাঙ্গালীরা পুরীধামে রথযাত্রায় যাইতেন, তখন পুনর্জ্জন্ম প্রতিষেধের বাসনাই রথযাত্রিগণের হৃদয়াধিকার করিত। সেই বিশ্বাসে তাঁহারা রথে শ্রীবিষ্ণু-সন্দর্শন করিতেন।

বৈষ্ণবগণের উপাসনায় ভক্তিই প্রধানতম সাধন। মুক্তি ভক্তির দাসী। তথাপি শ্রীবৈষ্ণব ও মাধ্ব সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ একবার মুক্তিকামনা ত্যাগ করেন না। রথে বিষ্ণু-সন্দর্শন জনিত যে মুক্তিফলাশা চরিতার্থ হয়, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীমাধ্বগণ একেবারে সে ফলাশা ত্যাগ করেন না। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও শ্রীরাধাবল্লভীয় সম্প্রদায় শুদ্ধ ভক্তিতে শ্রীভগবানের সেবা করেন, মুক্তিকামনা তাঁহাদের লক্ষ্য নহে। তথাপি তাঁহারা শ্রীরথযাত্রা দর্শন করেন। সে দর্শন-ক্রিয়ায় মুক্তির বাসনা নাই, কিন্তু লীলাময়ের লীলাব্যাপার স্মরণ করিয়া ভক্ত-হৃদয়ে স্বতঃই আনন্দানুভব হয়, সে আনন্দ কেবল শ্রীভগবানের কথাই হৃদয় পটে জাগাইয়া তুলে—ইহাই তাঁহাদের লাভ। তাঁহারা এজন্য আত্মশুবি কোন এক আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক ব্যাখ্যা করিয়া রথযাত্রা-রহস্যের মর্ম্মতলে প্রবেশ করিতে প্রয়াস পান না—বিকৃত ব্যাখ্যার বিপরীত ব্যাপারে চিত্তার্পণ করিয়া তাঁহারা রথযাত্রার অর্থগ্রহণ করেন না।

আসল কথা এই যে ভগবল্লীলার রূপক বা তদ্‌ভাবাক্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়া বুঝিতে প্রয়াস পাওয়া প্রকৃত সত্যের হানিকর ও গ্লানিকর। কাজেই প্রকৃতভক্তগণ কাল্পনিক যুক্তির জন্য লালায়িত নহেন। তাঁহাদের মতে লীলাময়ের লীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" প্রভৃতি বাক্যের তাৎপর্য্য অবলম্বনে আধ্যাত্মিক রথযাত্রার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের আকার প্রকার

সম্বন্ধেও বহুল কল্পনা করা সম্ভবপর হইতে পারে কিন্তু তাদৃশ কল্পনা বিশুদ্ধ প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয় না বলিয়া আস্তিক হিন্দুগণ ও বিশ্বাসী ভক্তগণ ঐরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন না। আমরা ভাগবতীয় লীলার রূপক ব্যাখ্যা বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পক্ষপাতি নহি।

দাদাঠাকুরের হাসি
ও
ব্রজের কথা।

আমার এক দাদাঠাকুর ছিলেন—নাম ছিল হরিদাস। তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর পার হইয়াছিল, উপর পাটির দন্তপাতির সম্মুখের ভাগে কয়েকটামাত্র দাঁত ছিল। কিন্তু মুখখানি সর্ব্বদাই প্রফুল্ল—হাসি ছাড়া তিনি কোন কথা বলিতেন না—এমন মধুর হাসি আমি আর কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

যৌবনে এক ইন্দুমুখী আমার মুখের দিকে চাহিয়া আড়নয়নে মৃদুহাসি হাসিতেন—অথচ প্রতিদান কিছুই পাইতেন না। সে হাসির কথা এখনও মনে আছে, কিন্তু আমি সত্যই বলিতেছি, সে হাসি আমার দাদাঠাকুরের প্রাণভরা হাসির মত আমার প্রাণে এমন জগৎছাড়া আনন্দ আনিয়া দিতে

পারিত না। উহা এ জগতের জিনিস—এ জগতের মতই ছিল—আমার একটি ক্ষুদ্রবালিকা ছিল—সে ভাঙ্গাভাঙ্গা দুই একটী কথা বলিতে শিখিয়াছিল, তাহার কণ্ঠ বড় মধুর ছিল, সে যখন মুক্তার মত দাঁত দুইটী বিকাশ করিয়া হাসিত, তাহাতে আমি একটী সরল সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্য দেখিতে পাইতাম—উহা ইন্দুমুখীর হাসি অপেক্ষা বহু মূল্যবান্ বলিয়া মনে হইত, কিন্তু আমার দাদাঠাকুরে হাসির তুলনা খুজিয়া পাই না। শ্যামসুন্দর বাঁশী বাজাইয়া বৃন্দাবনবাসীদিগকে বিমুগ্ধ করিতেন কিন্তু এই বৃদ্ধ কেবল হাসির ছটায় বাস্তবিকই আমায় কিনিয়া লইয়া ছিলেন।

প্রিয় পাঠক, আপনি এখনও মনে করিতেছেন আমি উন্মত্তের মত অতিরঞ্জন করিয়া কি-না কি বলিতেছি। বাস্তবিক ইহাতে অতিরঞ্জন কিছুই নাই। দাদাঠাকুরের হাসি এত উজ্জ্বল, এত মধুর ছিল কেন, আমি তাহার কারণ এতদিনে খুঁজিয়া পাইয়াছি। আপনাদিগকে বুঝাইতেছি।

দাদাঠাকুরের নাসায় ও ললাটে গোপীচন্দনের সুপ্রসর হরিমন্দির; হাতে হরিনামের ঝোলা, দিবানিশি ঐ ঝোলাই তাঁহার ভূষণ। তিনি লোকের সহিত কথা বলিতেছেন, আবার মালাও জপিতেছেন। তিনি বাহিরে সংসারী—কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে দিবানিশি বিরাজ করিতেছেন—রসময় কংসারি!

কথাবার্ত্তা তাঁহার বহিরঙ্গ ব্যাপার। কিন্তু হৃদয়ে তাঁহার আনন্দ বৃন্দাবন—ঐ ধ্যান ঐ জ্ঞান ঐ নিদিধ্যাসন। এমন নিত্যানন্দের নিষ্ঠাবান্ উপাসকের হৃদয় হইতে যে আনন্দের

আলোক, হাসির লহরী সহ ফুটিয়া উঠে, তাহা কত মূল্যবান্, প্রিয় পাঠক তাহা এখন অবশ্যই বুঝিতে পারিলেন।

আমার দাদাঠাকুরের হাসিতে আমি ব্রজবৃন্দাবনের খবর পাইতাম। তাঁহার হাসির সহিত ব্রজের আলোক ফুটিয়া বাহির হইত,—সে কি সুন্দর,—কি মধুর!

ব্রজরসের উপাসক জগতের এক আনন্দবিগ্রহ্। দাদাঠাকুর আমাদের আনন্দবিগ্রহ ছিলেন। অতি বিষণ্ণ হৃদয় লইয়া তাঁহার নিকটে গিয়া বসিতাম; আনন্দ লইয়া ঘরে ফিরিতাম। তিনি ব্রজলীলার এক একটি কথা বলিতেন— প্রত্যেক কথাই হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিত। কথা বলিতে বলিতে হাসির সহিত নয়নকোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিত, তাহাতে তাঁহার মুখখানি আরও মধুর করিয়া তুলিত।

তাঁহার মুখে আমরা,—ধীর সমীর, কুঞ্জকুটীর, শ্রীরাসমণ্ডল, নিকুঞ্জবন, যমুনাতটে বংশীধারী, বাঁশীর রবে রাই কিশোরী— এইরূপ ব্রজের কত কথা শুনিতাম। তিনি মাথুরলীলা কখনই বলিতেন না। গোষ্ঠলীলা, মানলীলা, দানলীলা, দাসখতের কথা এমন করিয়া বলিতেন, যেন তাঁহার নিজের দেখা! কেবল তাহাই নহে, এমন করিয়া বলিতেন যেন আমরা ব্রজলীলার জীবন্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছি।

এক দিন তিনি কালীয়দমন-লীলার কথা এমন করিয়া বলি-লেন যে আমি দাদাঠাকুরের ভাষা ভুলিয়া গিয়া,—কণ্ঠরব ভুলিয়া গিয়া,—নয়ন সমক্ষে কালিন্দীর কালজল—সেই গভীর কালজলে

কালিয়ার শত ফণা, আর সেই শত ফণার উপরে কালিয়াদমন কালাচাঁদের নটবর মোহনমুরলীর মনোহর মূর্ত্তিবিলাস প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। দাদাঠাকুরের কথা অনেকক্ষণ ফুরাইয়াছিল, কিন্তু আমার শুনা ফুরাইল না। তিনি তখন তেমনি করিয়া তাঁহার স্বভাব-সুলভ মধুর হাস্য রবে বলিলেন—"এমন ক'রে ওখানে কি দেখছিস?"

আমার চমক ভাঙ্গিল, প্রত্যুত্তরে বলিলাম তুমি যা দেখাচ্ছিলে তাই"—দাদাঠাকুর আবার তেমন করিয়া হাসিয়া বলিলেন্ "ব্রজের কথা কেহ শুনিতে পায়—কেহ বা শুনিতে শুনিতে দেখিতে পায়। যাহারা দেখে তাহারা ভাগ্যবান্!"

আমি বলিলাম, যিনি শুনাইতে বসিয়া দেখাইয়া দেন, তিনি সেই ভাগ্যবানের মহাগুরু।"

আমি তাঁহার চরণ মূলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া—তাঁহার চরণ যুগল দুই হস্তে স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম।—

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

আমরা এইরূপে শ্রাবণের বর্ষায় দাদাঠাকুরের নিকট ব্রজের কথা শুনিতাম—দেখিতে দেখিতে শ্রাবণের সন্ধ্যা সমাগত হইত —আর তাঁহার আশ্রমের পাশের সন্ধ্যা মালতী ফুলগুলি হরিত-পাতার উপরে উপরে নবরাগে ফুটিয়া উঠিত—কেমন সুন্দর, কেমন মধুর! এখন মনে হয়—উহা যেন কেবলি নিশার স্বপন!

ব্যাকুলতা

হে অখিল-রসামৃত-সিন্ধো, এ জীবনমরু এখন তোমাকেই চায়। জীবন যখন শুষ্ক হয়, জগতের কোন রসই যখন নীরস হৃদয়ে একবিন্দু শান্তি দিতে সমর্থ হয় না, মানুষ তখন নিরতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে সেই প্রতপ্ত মরুতে, কেবল তোমার শান্তি-সুধাই জীবের হৃদয়ের আগুন নির্ব্বাপণ করিতে পারে।

এ কর্ম্মময় বিপুল সংসারে এ অলস নিকর্ম্ম জীবনের যে কি প্রয়োজন আছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। যাঁহারা তোমার শক্তিতে কর্ম্ম পথের পথিক, তুমি তাঁহাদের নয়ন সমক্ষে অনন্ত কর্ম্মের দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছ, তাঁহারা তাহাতে আকৃষ্ট হইতেছেন, তোমার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতেই দেহেন্দ্রিয় মন ব্যাপৃত রাখিতেছেন। সেই সকল কর্ম্মযোগীদের চিত্ত কর্ম্মে ব্যাপৃত,—তাঁহার অনন্ত কর্ম্মে তোমারই আলোক, তোমারই ইঙ্গিত দেখিতে পাইয়া তোমাকেই স্মরণ করিয়া তোমাকেই মনন করিয়া তোমারই অনুধ্যান করিয়া তোমার কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইহারা ধন্য। আমার কর্ম্মফলে এইরূপ কর্ম্মক্ষেত্র আমার অপ্রাপ্য, কর্ম্মশক্তিও সুদুর্লভ; কর্ম্মপথও সংনিরুদ্ধ।

যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ জ্ঞানচর্চ্চা

করিতে করিতেও কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অদৃশ্য হন না। তাঁহারা স্বাভাবিক ভাবে কর্ম করেন, কিন্তু জ্ঞানই তাঁহাদের চিত্তবৃত্তির প্রধানতম অবলম্বনীয়। ইঁহারা তোমার অনুসন্ধানে থাকিয়া তোমায় ভাবিতে চেষ্টা করেন, তুমি ইঁহাদেপ চিত্তবৃত্তিসমূহকে তোমার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রাখ—ইঁহারাও তোমারই সাধক; ইঁহারা জ্ঞানীভক্ত,—ইঁহারাও ধন্য।

যাঁহারা কেবল ধ্যানী—যাঁহারা প্রতিনিয়ত তোমাকেই ধ্যান করেন, কোনপ কর্ম্মের সহিত যাঁহাদের সম্বন্ধ সংস্রব নাই, তাদৃশ ভাগ্যবান্ সাধকগণের চিত্তও তোমারই অনুসন্ধানে বিভোর। শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদের এই অবস্থাকে সংপ্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত, সবীজ ও নির্ব্বীজ, সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প প্রভৃতি কত প্রকার নামেই অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের চিত্তের দৃঢ়তা ও সামর্থ্যের কথা স্মরণ করিলে একবারে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহাদের বীরত্বের তুলনায় ভুবন-বিজয়ী দৈত্যবলও অতীব নগণ্য ও তুচ্ছ। বহিঃশত্রু দমন করা অপেক্ষা অন্তঃশত্রু দমন করা অতীব কঠোর ব্যাপার। যাঁহারা ধ্যানযোগে যোগী, তাঁহাদের মানসিক বল জগতের বিস্ময়জনক। যে সকল লোক স্বার্থময় সংসার কার্য্য লইয়া ব্যাপৃত, তাহাদের মন তোমা হইতে বিক্ষিপ্ত, তাঁহারা এই শ্রেণীর ধ্যাননিরত সাধকের চিত্তের অসীম প্রভাবের বিষয় ধারণাতে আনিতে অসমর্থ। ফলতঃ যাঁহারা মনোগত সর্ব্বকামনা পরিত্যাগ করিয়া তোমার অনুসন্ধানে বিভোর, তোমার চিন্তায় ও তোমারই ধ্যানে নিমগ্ন, তাদৃশ মহাত্মগণকে

দর্শন করিলে মানুষ কৃতার্থ হইতে পারেন। কিন্তু এ সংসারে তাদৃশ তথাগত অতি বিরল।

অনন্যচিত্ত ভক্তগণের কথা আর কি বলিব? তাঁহারা আনন্দময়। তাঁহাদের চিত্তে দুঃখ-তাপের প্রবেশাধিকার নাই। ভক্তি-যমুনাবগাহী ভক্তগণের আনন্দময় চিত্তে তোমার অশেষ-কল্যাণময়, অশেষ সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যময় লীলাবৈচিত্র্য অনুক্ষণ সমুদিত হয়। তাঁহারা নিরন্তর শ্রীবৃন্দাবন-সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য-সুধা-রসে পরিষিক্ত থাকিয়া তোমার সেবারসে বিভোর থাকেন। সে সুখ ইন্দ্রাদিদেবতারও দুর্ল্লভ। সাধনরাজ্যে ভক্তহৃদয়ের তুলনা নাই, এতাদৃশ ভক্তের চরণরজঃ-প্রসাদে পাষণ্ডও দেবদুর্ল্লভ ভক্তিধনের অধিকারী হয়, তাহার তামসচিত্ত সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ হয়, সেই সাত্ত্বিকতার অভ্যন্তরে তোমার জ্ঞান, তোমার প্রীতি বসন্তকাননের সুষমাপূর্ণ কুসুমের ন্যায় অনন্ত সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। সে হৃদয়ের স্তরে স্তরে, হে অখিলামৃত রসমূর্ত্তি—তোমারই বিমল মধুর রসের অনন্ত প্রস্রবণ উৎসারিত হয়। সে হৃদয়ের আনন্দময়তা কবিকল্পনারওও দুরধিগম্য।

হে আনন্দলীলারসবিগ্রহ—তোমা হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়া ভীষণ মরুতে আর কত কাল এ ভাবে কাল কাটাইব? ক্ষুদ্র কীটাণুর সামর্থ্যও আমার নাই। হে দুঃখহরণ পতিতপাবন শ্রীগৌরসুন্দর, এ পাষণ্ড শিরে কবে তোমার প্রিয়ভক্তের চরণরেণু স্পর্শ হইবে,—কবে সুখদুঃখ ভুলিয়া তোমার শীতল চরণের আশ্রয় পাইব?—হে পতিতপাবন, কৃপা কর।

শারদ মেঘ

প্রশান্ত নির্ম্মল নীল
শারদীয় গগনের গায়
শুভ্র শারদীয় মেঘ
সুগম্ভীর ধীরে বয়ে যায় ;
অজানা আকাশ পথে
উদাসীন চলিয়াছ তুমি,
যেতে বুঝি নাহি সাধ,
তাই কি চলিছ থামি থামি ?
নাই বুঝি এ সংসারে কেহ
তোমারে আপন বলি জানে ?
দিবা কি বা নিশায় তোমায়
আপন বুকেতে লয় টেনে ?
লক্ষ্যহীন কক্ষ্যহীন হয়ে
শূন্যে শূন্যে ভ্রমিছ নিয়ত,
হৃদয়েতে নাহি স্নেহ-রেখা
বিরাগ বিবশ যেন কত ?
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী যথা
নাহি জানে রসের সংবাদ,
উদাসীন সারাটী জীবন
নাহি জানে হরষ বিষাদ।

শ্রীকালীদাসী দেবী

জীবের গতি

আমরা সংসার লইয়া মত্ত, নিজের সুখ দুঃখের ভাবনাতেই দিবানিশি অস্থির, এ সংসারের গণ্ডী ছাড়িয়া অবশ্যই একদিন চলিয়া যাইতে হইবে, ইহা অতি সত্য কথা,—আমরা ইহা জানি, বুঝি, সময়ে সময়ে মনেও করি, কিন্তু সতত সে কথা মনে রাখিতে পারি না,—মনে রাখিয়া তাহার মত কাজ করিতে পারি না, ইহা মায়ারই ছলনা।

এতটুকু ভাবিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি, মায়ার রাজ্যে আমাদের দুঃখ ভিন্ন সুখ নাই। যাহা সুখ বলিয়া মনে করি, তাহার ভিতর দিয়া অনবরত দুঃখের অনল শিখা উধাও ভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে, দুঃখ দুর্ভাবনার বিরাম নাই, তথাপি আমরা এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণের পথ দেখিতে পাই না—মোহের এমনই প্রভাব!

মদমত্ত মাতাল আপন খেয়ালে চলে, অপরের কথা শুনে না, সদুপদেশকারীকেও বিদ্রূপ করে, মনে ভাবে সে যেন কতই বুঝে। কিন্তু অপর লোক তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া কষ্ট পায়, সে নিজে তাহা বুঝে না। পথের ধূলিতে পতিত হইয়াও নিজকে বাদসার মত জ্ঞান করে। আমাদের অবস্থা এই মাতাল অপেক্ষাও শোচনীয়। আমরা যে কি অবস্থায় আছি, একবার ভাবিয়া দেখিলেই সহজে বুঝা যায়। লক্ষ্মী চিরচঞ্চলা, জীবনের আলোক-

ক্ষণস্থায়ী, ধনজন জীবন যৌবনের বিশ্বাস অতি কম—এই আছে, দেখিতে দেখিতে এই নাই—ভয়ানক ইন্দ্রজাল! জীবন-রহস্যের ও সংসারের এই নিদারুণ ভেল্কী কাহার ও অজানা নহে। কিন্তু তথাপি মোহাক্রান্ত মানুষ নিত্য সুখের পথ অনুসন্ধান করে না, মানুষের প্রাণ নিত্য সুখ খুঁজিতে আকুল হয় না। ইহাই মায়া-রহস্য। মানুষের একান্ত কর্ত্তব্য—আত্মোন্নতি করা; "আমি কে, আর ত্রিতাপই বা আমায় দগ্ধ করে কেন" ইহার একটু অনুসন্ধান করা; যাঁহারা এ কথা ভাবেন না, তাঁহারা চিরদিনই দুঃখে ডুবিয়া থাকিবেন। অভাবের তাড়নায়, যমের যাতনায়, বিবিধ ভয়ের বিভীষিকায় নিরন্তর তাঁহাদিগকে বিত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেই তুলিবে। তাঁহারা ধনী হউন, আর নির্দ্ধন হউন; পণ্ডিত হউন, অথবা মূর্খ হউন,—দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণের তাঁহাদের পক্ষে সম্ভাবনা অতি অল্প।

যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁহারা এই নিমিত্ত নিত্য সুখের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন, সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাদের উপদেশানুসারে সাধনার পথে প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহারা এই উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন, যিনি এই জগৎ যন্ত্রের পরিচালক, তিনি জীবগণের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তারের জন্য মানুষের সমাজে আবির্ভূত হয়েন। "অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষীং তনুমাশ্রিতং" ইহা শ্রীভগবানেরই শ্রীমুখের উক্তি। তিনি যে পরম দয়ালু, তাঁহার অবতারই তৎসম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ। শ্রীভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ জীবদিগকে শিক্ষা না দিলে মানুষ তর্ক শিখিতে পারে,

কিন্তু ধর্ম্মের যাহা সার সত্য, ধর্ম্মের যাহা আস্বাদ্য' মানুষ তাহা কোন ক্রমেই বুঝিতে পারে না। এই নিমিত্ত দয়াময় শ্রীভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। মানুষ, কাননে পর্ব্বতে আকাশে সাগরে যে মহাসত্ত্বার আবির্ভাব অনুভব করে, তাহাতে তাহার ভজনতৃষ্ণা চরিতার্থতা হয় বিশ্বের মধ্যে বিশ্বেশ্বরের আভাস উপলব্ধ হইলেও মানুষ তাঁহার আরও ঘনীভূত আনন্দ মূর্ত্তি দেখিতে ব্যাকুল হয়। তখন আনন্দ মূর্ত্তি শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রেমিক সাধক-শ্রেষ্ঠের এই আকাঙ্ক্ষা সম্পূরণ করিয়া আনন্দ মূর্ত্তিতে তাঁহার নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হয়েন। এই আনন্দ ঘনমূর্ত্তি-সন্দর্শন,—মহাসাধনার ফল।

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার একদিকে যেমন প্রেমিক সাধকের মহা সাধনার অমৃতময় ফল; অপর দিকে উহা শ্রীশ্রীভাগবতী দয়ারও সবিশেষ পরিচায়ক। শ্রীভগবান্ দয়া করিয়া প্রকাশ না পাইলে জীব অনন্তকাল তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে খুঁজিয়া পায় না। প্রেমানন্দময় উজ্জল মধুর মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর জীবকে যে প্রেমের ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, গম্ভীরা-মন্দিরের নীরব নিভৃত কক্ষেই তাহার পূর্ণ পরিণতি। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের এমন তীব্র ব্যাকুলতা, শ্রীবৃন্দাবন লীলাতেও বুঝি প্রকাশ পায় নাই। কিরূপে প্রেমময়ী শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের তীব্র জ্বালা অনুভব করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-জলধি-মূর্ত্তির ঐকান্তিক ভাবনায় নিমজ্জিত থাকিতেন, গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর তাহা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া আস্বাদন করিয়াছেন। মধুময় অখিল

রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য জীবের কিরূপ অনুরাগ ও ব্যাকুলতার প্রয়োজন, গম্ভীরা-লীলাতেই তাঁহার পূর্ণ প্রকাশ। সর্ব্বশ্রেণীর সাধক মহোদয়গণকেই এই লীলাআস্বাদন করিতে প্রস্তুত হওয়া উচিত।

নিরাশ্রয়

দয়াময় রাধাকান্ত দীনের শরণ।
করিয়াছি তব পদে আত্ম সমর্পণ॥
কি হইবে গতি মোর বুঝিতে না পারি
সহায় বান্ধবাহীনা অবোধিনী নারি।
তোমার বিচিত্র লীলা বুঝিতে কে পারে।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ কত ধ্যান করে।
তাদিগেও তুমি নাহি দাও দরশন;
গোপের অঙ্গনে কর সদা বিচরণ।
স্তুতিতে না পায় তোমা দেবতা নিকর,
গোপীর গালিতে তুমি তুষ্ট নিরন্তর।
যে করে তোমার পদ একান্ত শরণ,
তাহাকেও কর ত্যাগ; একি আচরণ॥
দময়ন্তী আসিয়াছে তব পদ আশে।
রাখিবে কি দয়া করি ও চরণ পাশে॥

শ্রীদময়ন্তী দেবী

ভজন কুটীর

এ মর জগতে এখনও গোলক বৃন্দাবন পরিলক্ষিত হয়েন। মানুষের হৃদয় হইতে সাধনার ফলে যখন একে একে পার্থিব স্বার্থ-বাসনা গুলি শেষ বিদায় গ্রহণ করে, হৃদয় যখন বিষয়-তরঙ্গের অভিঘাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শান্তিসুখ উপভোগ করে, সেই অবস্থায় মানুষের হৃদয় প্রেমময়ের কৃপায় ভজন-রসের সঞ্চার হয়,—বেলা, যুঁথি প্রভৃতি সাদা সাদা ছোট ছোট পবিত্র মৃদু সদ্‌-গন্ধি ফুলগুলির ন্যায় হৃদয় কুসুম অতি পবিত্র সুষমায় সুশোভিত হয়। এইরূপ হৃদয় লইয়া ভক্ত ভজন কুটীরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে তিনি গোলক-বৃন্দাবনের সুধারসাস্বাদে পরিতৃপ্ত হয়েন। এখানে লোক-কোলাহল নাই, দম্ভ-গৌরবের স্থান নাই, যশঃপূজা-প্রতিষ্ঠার গন্ধ নাই, পার্থিব ভোগতৃষ্ণার লেশাভাসও এখনে দৃষ্টি হয় না। ভজন কুটীর—স্বভাবতঃই শান্তিময়, পবিত্র উদ্বেগ-উন্মাদনাবিহীন, অধিকাংশ সময়ই নীরব। কিন্তু একবারে নীরব নয়। সে দিন খুব প্রত্যূষে দেখা গেল, কুটীরে দুইটী কন্থাধারী বৃদ্ধ ভিখারী খঞ্জনি বাজাইয়া মৃদুল কোমল কণ্ঠে গাইতেছেন :—

জয় কৃষ্ণ,—কৃষ্ণ গোপাল, গোবর্দ্ধন-ধর নন্দ-দুলাল।
জয় গোবিন্দ মুকুন্দ মুরারি বনোয়ারী
জয় জয় মনোমোহন কুঞ্জ-বিহারী
জয় কৃষ্ণ গোপাল, মাধবমোহন ঘনশ্যাম
জয় জয় মুনিজন-মানস-বিশ্রাম,
করুণা কর কৃষ্ণ দয়াল ; জয় কৃষ্ণ,—কৃষ্ণ গোপাল।

ভক্তি-পরিষিক্ত সুধামধুর কণ্ঠে বৃদ্ধদ্বয় যখন এই সঙ্গীতের আনন্দ উৎস উৎসারিত করিতে ছিলেন, তাঁহারা গানের সাথে মিলিয়া মিশিয়া যেন এক হইয়া গিয়াছিলেন। আমার সঙ্গে এক-জন বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন, তিনি লীলারসের বেদান্তে ইতঃ-পূর্ব্বে প্রবেশলাভ করেন নাই। "জয় জয় কৃষ্ণ গোপাল" পুনঃ পুনঃ এই নাম শুনিতে শুনিতে তাঁহার হৃদয় কেমন নরম সরল ও সরস হইতেছিল। ভিখারীদ্বয় আবার গাইতে লাগিলেন :—

সচ্চিৎ আনন্দ গুণগ্রাম,—সঙ্কর্ষণ হরি সুখধাম।
পরমেশ্বর পরম কৃপাল,—জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোপাল।

আমার সুহৃদ্‌বর তখন অমার কণ্ঠ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নে ইতঃপূর্ব্বে আমি কখনও অশ্রু দেখিতে পাই নাই, শারদ আকাশের ন্যায় তাঁহার নির্জ্জল নির্ম্মল নয়নে সে দিন আমি সর্ব্বপ্রথমে অশ্রুর প্রবাহ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কিন্তু তখন কিছুই বলিলাম না। যাঁহারা গান করিতেছিলেন, তাঁহাদের নয়নে অশ্রু ছিল না—যে অবস্থায় অশ্রুপাত হয়, তাঁহারা সে অবস্থার অনেক উপরে থাকিয়া দয়াময়েব নাম করিতেছিলেন। ভাবেরও ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। ভাব যখন অতীব গভীর হয়, সেই ভাব-ঘন অবস্থায় প্রেমাশ্রু পরিলক্ষিত হয় না।

ভগবানের নাম গুণলীলা প্রভৃতির গান বৈষ্ণব সমাজে শুনিতে পাওয়া যায়। সকলেই যে রসের ঔচিত্য বজায় রাখিয়া, গানের ভাবের সহিত কণ্ঠের স্বরের সামঞ্জস্য রাখিয়া গান করিতে পারেন, এমন নয়। বিশেষতঃ রসকীর্ত্তন অতীব কঠোর ব্যাপার। নানা

দোষে রসকীর্ত্তন, শ্রবণের অযোগ্য হয়েন। কিন্তু নাম-কীর্ত্তনে সে আশঙ্কা অতি অল্প। আমি সেই সাহসেই সে দিন ভজন-কুটীরে আমার সুহৃদ্বরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু অত্যাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই নামকীর্ত্তন,—আমাদের মত পাষণ্ডের হৃদয়েও তৎসময়ের জন্য কেবল নাম নহে,নামী ও নামীর সরস লীলা-প্রবাহ পর্য্যন্ত জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, নামের এতই প্রভাব, এতই কৃপা। যখন আমরা ফিরিয়া আসি, বন্ধু বলিলেন, এই নির্জ্জন কুটীরে এত আনন্দ ইহা আগে জানিতাম না। এতদিনে বুঝিতে পারিলাম, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ অরণ্যে অবস্থান করিয়া কি আনন্দ পাইতেন। বৃহদারণ্যরকের সার কথা আপনার কোন প্রবন্ধে পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু তখনও আমার সে অনুভূতি হয় নাই। আজ এই নীরব নিভৃতে পর্ণকুটীরে দুইটী ভিখারীব গানে আমার হৃদয়ে এক নূতন তরঙ্গ উঠিয়াছে। আমি অনেক যত্ন করিয়াও সে বেগ সম্বরণ করিতে পারি নাই। সচ্চিদানন্দ কল্যাণগুণগ্রাম শ্রীকৃষ্ণ আমায় কবে কৃপা করিবেন, কবে আমি এই ভিখারীদের মত আনন্দে আপনহারা হইয়া গাইব—

মাধব-মোহন-ঘনশ্যাম মুনিজন মানস বিশ্রাম।
জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোপাল—গোবর্দ্ধন-ধর নন্দদুলাল।

এমন ভরপুর সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের স্রোত আর কখনও আমি আস্বাদন করি নাই। শ্রীভগবানের নামে এত আনন্দ, নামের এত মহিমা—এত প্রভাব ও বৈভব—শাস্ত্রে পাঠ করিলেও—জীবনে অনুভব করি নাই।"

এই বলিয়া তিনি আমার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া আমার কণ্ঠ ধরিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। আমার মনে হইল— আজ কি সুপ্রভাত! ভজন কুটীরের প্রতি আমি চিরদিনই অনুরক্ত। বহু সংঘর্ষে—বহু গোলযোগে বসবাস করিলেও আমার প্রাণ ছুটিয়া ঐ বনের দিকে যায়। তাই কোলাহল ছাড়িয়া শান্তি-কুটীরে যাইতে ভালবাসি। কিন্তু আজ ভজন-কুটীরের অদ্ভুত কৃপাবৈভবে বিস্মিত হইয়াছি—আজ মরুভূমিতেও মন্দাকিনী প্রবাহ দেখিতে পাইলাম—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহারই কৃপা স্মরণ করিয়া গৃহে ফিরিলাম।

সাধনার সঙ্কল্প

সাধন ভক্তি দুইভাগে বিভক্ত—বৈধী ও রাগানুগা। রাগ বা রাগানুগা সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব না। বৈধী ভক্তির কথাই বক্তব্য। প্রবৃত্তির অধীন জীবের পক্ষে বৈধীভক্তি পরম হিত সাধিকা। এই বৈধী ভক্তি বহু প্রকার—ইহার বহু অঙ্গ। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ইহার ৬৪ প্রকার অঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতীয় প্রমাণানুসারে প্রধানতঃ নয় প্রকার বৈধী ভক্তির উল্লেখ আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে নবধা ভক্তির মধ্যে কীর্ত্তনের প্রধান্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীজীব

গোস্বামি মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের 'যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ' এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন নবধা ভক্তির মধ্যে কীর্ত্তনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন ইহার সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। এক্ষণে কীর্ত্তন-প্রচার আমরা দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু কীর্ত্তন-কারীদের হৃদয়ে এই ভজনের প্রভাব কিরূপ প্রতিফলিত হইতেছে, তাহা অবশ্যই জ্ঞাতব্য। ভগবন্নাম কীর্ত্তন হইতেছে কিন্তু সে সময়ও কীর্ত্তনকারীদের হৃদয়ে আসুরিক বুদ্ধি পূর্ণমাত্রাতেই রহিয়াছে ইহা প্রায়শঃই প্রত্যক্ষ করা যায়।

প্রকৃত কথা এই যে কেবল মৌখিক কীর্ত্তন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় না। চিত্তশুদ্ধির সাধনা প্রয়োজন। যে সঙ্কীর্ত্তনকারীর চিত্তে নিষ্ঠাময় সাধন সংকল্প নাই,—ভক্তি নাই,—সে স্থলে তাদৃশ ভাবের সমাগম সম্ভবপর নহে। হরিনামের মাহাত্ম্য আছে, ইহা স্বীকার্য্য; নামমাহাত্ম্যে অর্থবাদ প্রকল্পনও অপরাধজনক,—গ্রন্থপাঠে এসকল কথা জানা যায়।

শাস্ত্রীয় গ্রন্থের বাক্যগুলি জীবনে কি পরিমাণে প্রতিফলিত হইল, তাহাও তো দেখা চাই। কেবল অলীক কল্পনা লইয়া মানুষ কত কাল অতিবাহিত করিতে পারে; প্রকৃত কথা এই যে "যদি হৃদয়মশুদ্ধং সর্ব্বমেতদ্‌বিরুদ্ধম্"। বৈধী ভক্তি, শুদ্ধ-ভজনের সাধন-সম্পত্তি,—একথায় কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। সংকীর্ত্তন দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে—ইহাও সত্য।

কিন্তু আসল কথা এই যে সাধনার সংকল্প থাকা আবশ্যক। সাধকের হৃদয়ে এই সঙ্কল্প থাকা চাই, যে 'শ্রীভগবানের নাম লীলা গুণ শ্রবণ করিতে করিতে,—তাঁহার নাম-গুণ-লীলা গাহিতে গাহিতে, স্মরণ করিতে করিতে, অর্চ্চনা এবং বন্দনা করিতে, করিতে করিতে যেন আমার চিত্ত তাঁহার শ্রীচরণেই আসক্তহয়, ইতর কামনা যেন হৃদয় অধিকার করিতে না পারে;—যদি সেরূপ কুকামনা কুবাসনার ক্বচিৎ উদয় হয়, তাহা যেন ন্যক্কারজনক দুর্গন্ধিময় দুষ্ট পদার্থের ন্যায় তৎক্ষণাৎ পরিহার করিতে পারি;—যেন হৃদয় শ্রীভগবানের পবিত্র নামে পবিত্র গুণে পবিত্র মধুর লীলায় নিরন্তর নিমজ্জিত থাকে।' এইরূপ সঙ্কল্পে হৃদয় বাঁধিয়া,—এইরূপ সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া,—সাধন ভক্তির স্মরণ গ্রহণ করিলে ফল অবশ্যম্ভাবি ও সুনিশ্চিত।

শরতে শারদা

সুনীল শারদাকাশে শুভ্র জ্যোতি পরকাশে
গগন শোভিত স্ফুট চন্দ্র তারকায়;
উষারক্ত কন রাগে, কাননে বিহঙ্গ জাগে
শেফালি সুবাসে বায়ু ধীরে বহি যায়।

জ্যোতিতে তোমার জ্যোতি—স্বপ্রকাশ মহাদ্যুতি
অন্তরে বাহিরের আঁধার ঘুচায় ;
কাননে কাননে ফুল, গন্ধে নাসা সমাকুল
তোমার অঙ্গের গন্ধ ভাসিয়া বেড়ায় !
কমল কহ্লার ফুটে মধুলোভে অলি ছুটে
তোমার রসেতে মাগো জগৎ মাতায়,
প্রতিশব্দে তব গান শুনিয়ে বিভোর কাণ,
সে তান-ঝঙ্কার আসি পরশে হিয়ায় ;
সুস্নিগ্ধ সমীর বহে মনে হয় তব স্নেহে
পরশে পরশে অঙ্গ সতত জুড়ায়,
তুমি মা আনন্দরাণী নিত্য আনন্দের খনি
জগতে আনন্দ জ্যোতি তোমারি প্রভায়।
শতদৈন্য শত রোগে যদিও কর্ম্মের ভোগে
সুখাভাসলেশ নাহি ছিল বাঙ্গালায়,
তব শুভ আগমনে আজিকে সভার মনে
সুখের আলোক কণা তবু দেখা যায়।
তুমি যে মহামায়া গিরিজা শঙ্কর জায়া
অঘটন ঘটে মাগো তোমার লীলায় ;
দুর্দ্দিনে প্রফুল্ল বঙ্গ, এতো মা তোমারি রঙ্গ ;
প্রণমামি মহামায়া তব রাঙ্গা পায়।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী

শ্রীশ্রীদুর্গা

মা! তুমি সর্ব্বনামময়ী—কিন্তু আজ আমি তোমায় তোমার কোন নামে ডাকিব? ভক্ত তোমায় আনন্দময়ী বলিয়া ডাকেন—কিন্তু আমার সে অধিকার নাই। দশদিকে যাহার নিরানন্দ—প্রতি পলে যাহাকে দুঃখের তরঙ্গাভিঘাত সহ্য করিতে হয়, ভোগ করিতে হয়—সে কেমন করিয়া তোমায় আনন্দময়ী বলিয়া ডাকিতে পারে? যাহার চলিতে দুঃখ, বসিতে দুঃখ, নিশীথে নির্জ্জনে শয়নে স্বপনে যাহার দুঃখের তরঙ্গ সমুচ্ছসিত হইয়া উঠে—সে কিরূপে তোমায় আনন্দময়ী বলিয়া অনুভব করিবে? ত্রিতাপাভিঘাতে যাহার চিত্ত নিরন্তর বিমর্দ্দিত ও নিষ্পিষ্ট ও সন্তপ্ত সে কি তোমার আনন্দময়ী নামের অর্থ বুঝিতে পারে? লোকে যখন তোমায় আনন্দময়ী বলিয়া ডাকে—তখন আমি বিস্মিত ভাবে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকি।

যেখানে রোগ-শোকের তীব্র জ্বালা—দারিদ্র্য দুঃখের শত কশাঘাত,—নৈরাশ্যের হা-হুতাশ,—অভাবের হাহাকার,—বিপদ্ বিষাদের বৃশ্চিক দংশন,—সেখানে আনন্দময়ীর সত্তা যাহারা অনুভব করেন, তাহারা সাধু-যোগী হইতে পারেন, প্রেমিক ভক্ত হইতে পারেন, দেবতা হইতে পারেন কিন্তু জনসাধারণের সমাজস্থ তাঁহারা নহেন। সমাজের সহস্রকোটি লোকের এত ব্যথা দেখিয়াও যাঁহারা তোমার আনন্দ-মুখচ্ছবি-সন্দর্শনে নিরন্তর আনন্দানুভব করেন এবং তোমায় আনন্দময়ী

বলিয়া আহ্বান করেন—তাঁহারা তোমার রাজ্যেই বাস করেন—আমাদের এদেশের অধিবাসী তাঁহারা নিশ্চয়ই নহেন। আমি তাঁহাদের কথা ধর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি না। আমাদের বর্ত্তমান্ অনুভূতির মধ্যে তুমি যেরূপ ভাবে প্রকাশিত হও', আত্ম-প্রকটন কর তাহাই আমার অনুভাব্য ও অনুভাবিত।

আমি অবিদ্যার আঁধার-রাজ্যে বাস করি, আর যাঁহারা তোমার সন্তান তাঁহারা আনন্দের জ্যোতির্ম্ময় দেশে বিহার করেন। আমার এদেশে তোমার আনন্দ-রবি, আনন্দ-চন্দ্র ও আনন্দ-তারকার উদয় নাই—আমি তোমায় জ্যোতির্ম্ময়ী বলিয়াও জানিতে পারি না। এ হৃদয়ে ঘোর অন্ধকার - দেখ মা একবার চেয়ে দেখ—এখানে দিবানিশি কি ঘোর অন্ধকারের একচ্ছত্র রাজ্য। যদি তোমার কোনও নামে আমাকে সম্বোধন করিতে হয়, তবে আমি আমি তোমায় জ্যোতির্ম্ময়ী না বলিয়া আঁধারিণী বলিয়া ডাকিব—জ্ঞানদা না বলিয়া অজ্ঞান অবিদ্যা মায়া বা কালরাত্রি বলিয়া তোমায় সম্বোধন করিব ;—আনন্দময়ী বলিয়া নয়। অই নাম আমার প্রাণের ভাষার সহিত মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছে। আমার অনুভূতি ইহার উর্দ্ধে আর উঠিতে পারে না, মনে এক ভাব রাখিয়া মুখে আর এক কথা বলিতে পারিব না। আমি দিবানিশি অমঙ্গলের মধ্যে বাস করিয়া, অমঙ্গল অনুভব করিয়া, অমঙ্গলে অমঙ্গলে সমগ্র জগৎ আঁধার দেখিয়া তোমায় মঙ্গলময়ী ও জ্যোতির্ম্ময়ী বলিতে পারিব না।

যেমন রেখেছ, তোমায় তেমনি ভাবিব। আমি আত্মকর্ম্ম

মানি না। কর্ম্মতত্ত্ব—তোমারই তত্ত্ব। সকল কর্ম্মই তোমার, আমার কোনও কর্ম্ম নাই। রেখেছ অমঙ্গলে, মঙ্গলময়ী বলিয়া কিরূপে প্রণাম করিব? মনের সহিত তো প্রবঞ্চনা করিতে পারিব না—অপরের সহিত প্রবঞ্চনা চলে, আত্মমনের সহিত চলে না। প্রত্যয় ও বিশ্বাসে দৃঢ়তা জন্মে। যেখানে প্রত্যয় নাই, প্রত্যক্ষ নাই, সুতরাং অনুমানও নাই—সেখানে পরের কথায় যা তা বলিয়া আমি তোমার নিকটে উপস্থিত হইতে পারিব না।

এ জন্মে—এ জীবনে যে তোমায় আনন্দময়ী বলিব, মঙ্গলময়ী বলিব, সর্ব্বমঙ্গলা বলিয়া তোমায় প্রণাম করিব—এরূপ অনুভূতি তোমার নিকটে পাই নাই, তুমি দাও নাই—আমার যোগ্যতা বা অযোগ্যতার কথা এখানে কিছুই নাই। তুমি দাও নাই তাই পাই নাই। তুমি লীলা-বিলাসিনী। ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য, হর্ষ-বিষাদ আলো ও অন্ধকার লইয়াই তোমার এই জাগতিক লীলা। যাহাকে নিরানন্দের আশ্রয় করিয়াছ,—অন্ধকারের আশ্রয় করিয়াছে,—অমঙ্গল অজ্ঞানের আশ্রয় করিয়াছে,—সে তোমায় আনন্দময়ী বলিবে কেমনে, সে কেমনেই বা তোমায় জ্যোতির্ম্ময়ী বলিবে, সে তোমায় কেমনে সর্ব্বমঙ্গলা জ্ঞানদা বলিয়া জানিবে? তাহা হইলে যে তোমার লীলা হয় না। তাহা হইলে যে আলোক আধারে লীলা-খেলা প্রস্ফুট হয় না। তোমায় যাহারা বাজিকরের মেয়ে বলে, তাহারা তত্ত্বজ্ঞানী। এই কথাই ঠিক। তুমি মা নিশ্চয়ই বাজীকরের মেয়ে। তোমার এ বিশাল বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক বিস্ময়জনক ভোজের বাজি। বিরাম

নাই—বিশ্রাম নাই—পলে পলে, মা, কি খেলাই খেলিতেছে?
তোমার 'চিনিতে পারে জগতে এমন কে আছে—

"ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।"

তুমি অপারা, অনন্তা; হরিহরাদিও তোমায় জানিতে পারেন না। পাশ্চাত্য দার্শনিক বৈজ্ঞানিক তোমায় Mysterious Force বলিয়া বুঝিয়াছেন, কিন্তু বুঝিয়াও তিনি Agnostic অর্থাৎ কিছুই জানেন না। তাঁহার নিকট তোমার এই বিশ্বপ্রহেলিকা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। (Unknown and Unknownable) খুব ভেল্কী লাগাইয়া নিজে এই বিশ্বের অন্তরালে ও বাহিরে বিরাজ করিতেছে! তেমায় আমি জানি না, জানিবার ও আশা নাই—তবু তোমায় মা বলিয়া ডাকি? কেন ডাকি, তাহার কারণ খুঁজিয়া পাই না। মায়ের স্নেহ যে জীবনে পায় নাই, সে মাতৃভক্তির কি জানে? সে কেবল এই মাত্র জানে যে সে কাহারও গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে। তোমাকে মা বলাও আমার পক্ষে সেইরূপ। তোমার স্নেহ, তোমার করুণা হয়ত আমার প্রতি অজ্ঞাতসারে অজস্রধারে বর্ষিত হইতেছে—অন্ধ আমি, তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারি না, কিন্তু কেবল এতটুকু বুঝি এমন কেহ আছেন যিনি এ বিশ্বের প্রসূতি;—"সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।"—তিনি বিশ্বকে প্রসবকরেন।

There is a mysterious force from which this universe is evolved এমন কোন অজ্ঞের শক্তি আছেন, যাহা হইতে বিশ্বপ্রসূত হইয়াছে। তোমার সত্তামাত্র স্বীকার করিতে

আমি শিখিয়াছি—তুমি কেমন, আমি জানি না—সুখদা কি দুঃখদা—সর্ব্বমঙ্গলা, কি সর্ব্বামঙ্গলা তাহা আমি বলিতে পারি না। তুমি যেমনই হও, তাহাতে আমার কোন লাভ নাই, হানি নাই। তোমার কার্য্য তুমি কর;—লাভ তোমার,—হানিও তোমার। আমি তোমারই লীলার পুতুল—প্রাণ দিয়াছ,—তাই প্রাণী। সুখ দুঃখের অনুভূতি দিয়াছ—তাই এত ভোগ। অহং দিয়াছ—তাই 'আমার ভোগ'—কিন্তু এ সমস্ত লীলা-খেলা একবারেই ইন্দ্রজাল। এখানকার সুখ দুঃখ,—সবই ইন্দ্রজাল ইহা বুঝিবার শক্তি। হে শরৎকালের মহাদেবি—তুমি বুঝিতে শক্তি দাও,—যে এ সকলি তোমার লীলার ইন্দ্রজাল! ওগো বাজিকরের মেয়ে—আর তুমি আমায় কি দয়া করিতে পার? তোমার লীলার জগতে এ কীটকে অনেক সাজা'য়েছ;—রাজা করিয়া রাজসিংহাসনে বসাইয়াছ, আবার কখনো নরকের কীটকে বিষ্ঠা-কুণ্ডের কৃমিরূপেও নাচাইয়াছ। একবার সকলি দিয়াছ, আবার সকলি কাড়িয়া লইয়াছ। তোমার দেওয়া যেমন গূঢ়ার্থময়,—তোমার নেওয়াও তেমনি গূঢ়ার্থময়। আমাদের করুণ রোদন ও কাতর প্রার্থনা—এ সকলই অর্থহীন। তোমার যাহা ইচ্ছা,—তাহাই হয়।

তথাপি আজ এই বঙ্গে তোমার ভক্তগণ তোমার তথা-কথিত আনন্দময়ী শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনের ভাগ্য লাভ করিতেছেন। আমিও তাঁহাদেরই পশ্চাতে থাকিয়া তোমার যাদুকরী লীলায় কোনরূপে দিবসত্রয় অতিবাহিত করিব, বলিয়া মনে করিতেছি, কিন্তু কি হইবে তাহা তুমি জান।

আত্ম-প্রতারণা

ভক্তি কথা লিখিতেছি, পড়িতেছি, বলিতেছি,—সময়ে সময়ে ভক্তি কি, তাহা ভাবিতে প্রয়াস পাই, কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে কি উহার অনুভবের আস্বাদন দুর্লভ বলিয়া বোধ হইতেছে। জগতের সহিত প্রতারণা প্রবঞ্চনা চলে, কিন্তু নিজের মনের সহিত প্রবঞ্চনা চলে না—ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু সময়ে সময়ে দেখিতে পাই, আমরা নিজের মনকেও প্রতারিত করি। অভ্যস্ত ইন্দ্রিয় সুখভোগের কালেও মনে করি, যে উহা ভগবদ্ভক্তির অনুকূল।

সাধকগণ দৃঢ়চিত্তে স্থিরভাবে আসনে উপবিষ্ট হইয়া একমনে শ্রীভগবচ্চিন্তা, শ্রীভগবন্নাম জপ সাধন করেন, আমি হয় তো সেরূপ ভাবে উপবেশন করা ক্লেশকর মনে করি; আমি আমার কোমল শয্যায় উত্তানভাবে শয়ন করিয়া ভগবচ্চিন্তার লেশাভাস মনে করিতে করিতে শত সহস্র বৈষয়িক চিন্তায় মনকে ডুবাইয়া দি, তথাপি মনে করি আমি বুঝি ভগবচ্চিন্তাই করিতেছি। মানুষের আপন মনের সহিতও এমনি প্রতারণা!

সাধনা, আত্মার সাধের সামগ্রী। নিজ দেহে এত প্রীতি রাখিলে কি সাধনা চলে? দংশ-মশকের অত্যাচারে বা দুর্ভাবনায় নিশায় নিদ্রা নাই, শয্যায় এ-পাশ-ও-পাশ করিয়া রাত্রি প্রভাত করি, কিংবা শয্যা ত্যাগ করিয়া পথে পথে বেড়াই, কিন্তু মধুময় হরিনামে রুচি হয় না, তাঁহার নাম স্মরণে মননে চিন্তনে

কীর্ত্তনে প্রবৃত্তি হয় না, চিত্তের এতই অরুচি। তথাপি কৃষ্ণকথা শুনিয়া ভাবাবেশে নয়নে একবিন্দু জল দেখা দিলে মনে হয়—আমার হৃদয়ে বুঝি ভক্তির উৎস ফুটিয়া উঠিয়াছে—ইহাও মনের সহিত প্রতারণা। এইরূপে মানুষ ভজনরাজ্যের ভাবাভাস লইয়া আত্ম-প্রতারণা করে। যাহারা ধর্ম্মধ্বজী বকবৎসাধু, তাহাদের কথা তো বক্তব্যই নহে, কিন্তু যাহারা গোপনে গোপনে ভগবৎসাধন করেন, বাহিরের যশঃপূজা-প্রতিষ্ঠার আশা রাখেন না, তাঁহারাও ভাগবতী মায়ার প্রভাবে এইরূপ প্রবঞ্চিত হন, নিজের চিত্তের ত্রুটি বুঝিতে পারেন না, অন্তর্বৃত্তির দুর্ব্বলতার উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হন, অথচ নিজকে ভজন পথে অগ্রসর বলিয়া মনে করেন।

বিমল ব্রহ্মচার্য্য ও ইন্দ্রিয়সুখবিলাসে প্রখর বৈরাগ্য ও বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি ও ভক্ত সঙ্গ ব্যতীত কখনও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত সর্ব্বভক্তজন-সুসম্মত ভক্তিপথের পথিক হওয়া যায় না। ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিয়াছি ঐ সকল উপায় বই আর গতি নাই। দেহাত্মচিন্তার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে না পারিলে ভজন-সাধনার আনন্দ কখনও অন্য কোন প্রকারে উপলব্ধ হয় না।

"সংসারাশ্রমে পড়িয়া রহিয়াছি, এ অবস্থায় কিরূপে ভজন-সাধন করিব? স্ত্রীপুত্রকন্যার প্রতিপালনের জন্য,—নিজের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়—এ অবস্থায় শ্রীভগবানের চরণে মন দেওয়া অসম্ভব" ইহাই এক শ্রেণীর সরল-মতি ব্যক্তির মনের দুঃখ, অথবা ভজননিষ্ঠায় অসমর্থতার সান্ত্বনা

আপাততঃ এই দুঃখের হেতু সত্য বলিয়াই মনে হইতে পারে, যাঁহারা এরূপ কথা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন, তাঁহাদের এই উক্তিও সরলতা পূর্ণ। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে ইহাও মনের সহিত প্রতারণা মাত্র। ভজন-সাধনে রুচি থাকিলে সংসার তাহাতে বাধার কারণ হয় না। পরব্যসনিনী নারী সারাদিন গৃহকর্ম্মে ব্যগ্র থাকিলেও তাহার মন অহর্নিশি তাহার অভীপ্সিত রসেই পরিষিক্ত থাকে। কর্ম্মজগতে বিচরণ করিয়াও যে সাধক ভগবদ্ভজনে চিত্তবৃত্তি নিযুক্ত রাখিতে পারেন, ইহা হইতেই তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়। ফল কথা, ভজন-রাজ্যে আত্ম-প্রতারণা অত্যন্ত অহিতকর। সৎসঙ্গ-সেবা, পবিত্রতা সরলতা, বৈরাগ্য এবং সুদৃঢ়বিশ্বাস সহ নিরন্তর ভজনে প্রবৃত্ত থাকিলে আত্ম-প্রতারণা আদৌ হৃদয়ে স্থান পায় না।

ভজন-নিষ্ঠা

পুত্রকলত্রাদির ভরণপোষণ ভার স্কন্ধে লইয়া—অর্থোপার্জ্জনের বিবিধ চিন্তায় বিজড়িত থাকিয়া—শোকমোহাদির দুশ্চিন্তায় সর্ব্বদা ভীত সঙ্কোচিত থাকিয়া গৃহস্থ ভজন-নিষ্ঠায় অধিকার লাভ করিতে পারে কিনা, কেহ কেহ ইহা প্রশ্নের বিষয় বলিয়া মনে করেন, কিন্তু অনেকেই বলিবেন ইহা প্রশ্নের বিষয় নহে। এ অবস্থায় ভজন চলে না, ইহা নিঃসন্দেহ। যাঁহারা ভজন করিবেন, তাহা-

দের ভয় রাখা চলে না। ভজননিষ্ঠ ব্যক্তি প্রকৃত বীর। তাঁহার দৈন্যের ভয় নাই, রোগের ভয় নাই, শোকের আতঙ্ক নাই, মানাপমান ও লাভালাভের চিন্তা নাই। এরূপ নিশ্চিন্ত নির্ভীক না হইলে ভজননিষ্ঠ হওয়া যায় না।

এই কথায় প্রাগুক্ত প্রশ্নের একটী সমাধান হইল বটে, কিন্তু আর একটী নূতন প্রশ্নের উদয় হইল,—সে প্রশ্নটী এই যে, তাহা হইলে গৃহীর পক্ষে ভজননিষ্ঠ হওয়া সম্ভবপর কিনা? যাহাকে পুত্র কন্যাকলত্রাদির পোষণভার বহন করিতে হয়, অর্থোপার্জ্জন জন্য দিবানিশি চিন্তা করিতে হয়, এমন গৃহীরা ভজননিষ্ঠ হইতে পারে কি? ইহার উত্তর অতি সুস্পষ্ট। এমন গৃহীরা ভজননিষ্ঠ হইতে পারে না। কিন্তু গৃহস্থ মাত্রেই যে ভজননিষ্ঠ হইতে পারে না, এমন কথা বলা যায় না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীবাসুদেব ভগবদ্গীতায় নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠার যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তদনুসারে যিনি কর্ম্মযোগী হইতে পারেন, তাদৃশ কর্ম্মবীর গৃহস্থের পক্ষে ভজননিষ্ঠ হওয়া অবশ্যই সম্ভবপর।

এই শ্রেণীর নিষ্কাম কর্ম্মবীর মহাপুরুষগণ অন্য কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া একমাত্র শ্রীভগবানের শ্রীচরণাভিমুখে দৃষ্টি রাখিয়া জাগতিক কর্ম্মসম্পাদন করেন, কর্ম্মের ফলাফল সম্বন্ধে কোনও ভাবনা করেন না। সুখ দুঃখ লাভালাভ মানাপমান প্রভৃতির কোনও চিন্তা তাঁহাদের হৃদয়ে আসিতে পারে না, অথচ কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনে তাঁহারা এক পদও বিচলিত নহেন। এই শ্রেণীর ক্ষণজন্মা মহাপুরুষগণ গৃহী হইয়াও উদাসী; প্রচণ্ড-

প্রবল তাপসমূহের মধ্যে বাস করিয়াও স্নিগ্ধ শীতল ; অজস্র লোভ মোহের হট্টসংঘট্টের মধ্যে অবস্থান করিয়াও নিস্পৃহ ও নির্ব্বিকার। শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের কৃপাপ্রসাদে ইঁহারা সর্ব্বাবস্থাতেই শুচি ও স্থির-গম্ভীর। জগতের অস্থিরতা ও নশ্বরতা দেখিয়া ইঁহারা এখানকার কোনও বিষয়ে বলবতী আশা স্থাপিত রাখিতে ইচ্ছুক নহেন। একমাত্র সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দ-চরণে যতক্ষণ মতি রাখিতে পারেন, ততক্ষণই ইঁহাদের আনন্দ। তদ্ব্যতীত আর সকল কর্ম্মই ইঁহারা কর্ত্তব্যতাজ্ঞানে সম্পন্ন করেন। সে সকব কর্ত্তব্যতার ফল-বিচার একেবারেই ইঁহাদের কর্ম্মশক্তির উদ্রেক সাধনে অসমর্থ। এতাদৃশ কর্ম্মবীরগণ যখন ভক্তিযোগের অধিকার লাভ করেন, তখন ইঁহারা গৃহস্থ হইয়াও ভজননিষ্ঠ হইতে পারেন।

আবার অপর পক্ষে যাঁহারা সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগী বৈরাগী বলিয়া জনসমাজে পরিচিত, যাহারা সামজিক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েন নাই, অথবা স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া উদাসী হইয়াছেন, তাঁহারাই যে ভজননিষ্ঠ হইতে সমর্থ একথাও বলা যায় না। সংসার-বন্ধন কেবল স্ত্রীপুত্রাদিজনিত নহে—সংসার মনের। মনে যতদিন সংসার অবস্থান করে, ততদিন বনেও পূর্ণমাত্রাতেই সংসার বিদ্যমান থাকে। বনে গেলেও বিষয় কামনা তিরোহিত হয় না, বনে গেলেও চিত্ত চাঞ্চল্য দূরীভূত হয় না, অপর পক্ষে অতৃপ্ত বাসনা চিত্তে অশান্তির তরঙ্গ আনিয়া দেয়, দিনযামিনী চিত্ত তাহাতে বিক্ষুব্ধ ও বিড়ম্বিত হয়। এ অবস্থায় ভগবচ্চিন্তা তো দূরের কথা,—গার্হস্থ্য জীবনে শান্তির যে

ক্ষণিক আভাস সম্ভবপর, এই শ্রেণীর উদাসীর জীবনে সে আশাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। ভজনানন্দ তো ইহাদের স্বপ্নেরও বহুদূরে অবস্থান করে। অপিতু ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী এই চতুরাশ্রমীর ষোল আনা আচরণ করিলেও ভগবদ্ভজনানুরক্ত না হইলে ভজন-নিষ্ঠ হওয়া যায় না।

দেহধারী জীবের বিশুদ্ধ ভজনে নানা প্রকার প্রতিবন্ধ বিদ্যমান। ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি নানা প্রকার জান্তববৃত্তিগুলি অহর্নিশ দেহের উপরে এবং চিত্তের উপরে নানা প্রকারে প্রভাব বিস্তার করে। তাহার ফলে বিশুদ্ধ ভজনানুরক্তির ভাবোদ্গম পর্য্যন্ত প্রকাশ পায় না, মানুষ জান্তব জীবনের কার্য্য লইয়া নিরন্তর ব্যস্ত থাকে। সেই ব্যস্ততার প্রাদুর্ভাবে ও প্রভাবে মানব চরিত্র পশুর স্বভাবে গঠিত হয়। কেবল নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতার বিষয়ে ভাবনা ও তৎসাধনে প্রযত্ন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। এ অবস্থায় ভগবৎস্মরণ মননাদি তো দূরের কথা; সাধারণ নৈতিকধর্ম্মগুলিও মানব জীবনে বিকশিত হইতে পারে না।

এই সকল প্রতিবন্ধ, পরাহত করিয়া ভক্তির ভাগরথী-প্রবাহের আনয়ন—প্রকৃতপক্ষেই এক ভগীরথের মহাসাধনা। সে সাধনার প্রথম পটল—সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ, তাঁহার সদুপদেশে দৃঢ় শ্রদ্ধা সংস্থাপন ও তদনুসারে ভজন ক্রিয়ায় প্রবৃত্তি। ভগবৎকৃপায় ও ভগবৎরূপী গুরুর দয়ায় উপাসকের ভাগ্যক্রমে তদীয় জীবনে ধীরে ধীরে ভজন-নিষ্ঠার সঞ্চার হয়। তদবস্থায় দয়াময়

শ্রীভগবান্ ক্রমেই শক্তি-সঞ্চার করিয়া ভক্ত-হৃদয়ে ভজন-নিষ্ঠা দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত করিয়া দেন। তাহার ফলে জীব পরমানন্দ-সাক্ষাৎকারে চিরদিনের জন্য কৃতার্থ হন।

শ্রীসচ্চিদানন্দ শর্ম্মা*

ভক্তের সাধনা

গৃহস্থ যদি সুখ পাইতে চাও,—তবে কপটতা দাম্ভিকতা ও কামিনীকাঞ্চনের লোভ ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ আশ্রয় কর। ইহাতে সংসারে বাধা পড়িবে না, ন্যায় পথে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন কর, আর সরল ব্যাকুল অন্তরে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের অনুসরণ কর। জীবমাত্রেই তাঁহার সত্ত্বা অনুভব করিতে চেষ্টা কর, জগতের প্রত্যেক পদার্থেই তাঁহার সৌন্দর্য্য মার্ধুয্য অনুভব করার জন্য সাধনা কর। দেখিবে তোমার হৃদয়ে শ্রীবৃন্দাবনের মধুময় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আরও দেখিবে অনন্ত মধুময় শ্রীভগবান্ তোমার প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ক্রমশঃই আবির্ভূত হইতেছেন, তাঁহার অখিলরসামৃতময় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য তোমার হৃদয় ও সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রেমামাধুর্য্যে পরিষিক্ত হইতেছে। শ্রীভগবান্ তর্কের বিষয় নহেন, তিনি রসরূপ, নিত্যপ্রেমানন্দস্বরূপ; তিনি আস্বাদের বস্তু, তিনি সম্ভোগের বস্তু। ভালবাসাই তাঁহার সাধনা। এই ভালবাসার একটী নাম ভক্তি। অনুভব ভিন্ন

* গ্রন্থকারের পরোলোক গত একবিংশবর্ষমাত্রজীবী একমাত্র পুত্র।

ভালবাসা যায় না। ইহা মানি যাহাকে দেখি নাই, যাহার সহিত আলাপ নাই, তাহাকে কি বলিয়া ভালবাসিব একথা স্বীকার্য্য। আগে দেখা শুনা চাই, তবে ভালবাসা জন্মে, ইহা সত্য। কিন্তু তাহার রাজ্যের বিধানে আরও একটা সূক্ষ্ম নিয়ম আছে। তাঁহাকে যাহারা ভালবাসেন,—"ওগো তাকে চখে দেখি নাই, কেবল নাম শুনেছি, মন প্রাণ দেহ তারে স'পে দিয়েছি" এমন কোথাও শুনা যায়। আবার আর একটা নিয়ম এই যে, তাঁহাকে আগে ভালবাসিতে হয়, পরে তিনি দেখা দেন।

তাঁহার ভালবাসা এজগতে তিনি ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, তাহা খুঁজিবার দরকার হয় না, যে দিকে চাই সেই দিকেই তাঁহার প্রীতির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মায়ের কোলে, মাতৃস্তন্যে, মায়ের যত্নে, এবং মায়ের মুখে তাঁহারই করুণ কোমল প্রীতির সজীব মূর্ত্তি সতত প্রকাশ পাইতেছে, জলে স্থলে চন্দ্রে সূর্য্যে তাঁহারই প্রীতির অনন্ত পরিচয় উদ্ভাসিত হইতেছে। তাঁহাকে জানিতে বা ধরিতে বড় বেশী সময় লাগে না। লোকে বলে তিনি সহজে ধরা দেন না,—আমি দেখি, তিনি ধরা দিবার জন্য সতত প্রস্তুত; প্রত্যেক পরমাণুর ভিতর দিয়া তাঁহারই পরিচয় সহস্র মুখে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সমগ্র জগতের মধ্যে কেবল তাঁহারই প্রকাশ। তিনি সমগ্র জগতে উদ্ভাসিত, তাঁহার মাধুর্য্যে জগৎ মধুময়, তাঁহারই সুগন্ধে জগৎ আমোদিত। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান। তিনি সর্ব্বত্রই আছেন, তিনি সর্ব্বত্রই সুপ্রকাশ, কিন্তু আমার দৃষ্টির দোষে তাঁহার স্থলে অপর কিছু

দেখি। দেখিতে জানিলে তাঁহাকে একটি দূর্ব্বাশিখস্থিত শিশির বিন্দুতেও দেখিতে পাওয়া যায়; ধরিতে জানিলে চ'খের এক ইঙ্গিতেই তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। তাঁহার অনুগ্রহ চাই একথা সত্য; কিন্তু জীবের প্রতি সদয় হইয়া সে অনুগ্রহ তিনি প্রায়শঃই করিয়া থাকেন,—তাহা না হইলে জীব কোন সাধনাতে কখনও তাঁহার সন্ধান পাইত না। সুতরাং তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় সহজেই হইতে পারে। যদি একবার নিখিল সৃষ্টির কোন কোন দ্রব্যের ভিতর দিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে চেষ্টা করিতে পার, যদি নয়ন মুদিয়াও চেষ্টা করিতে পার, তখন দেখিবে তাঁহার রূপ তোমার নয়ন-কোণে ঝলক দিয়া তোমাকে আপন করিয়া লইতেছেন, আর সেই সময়ে তুমিও তাঁহাকে আপনার হইতে আপন মনে করিয়া তাঁহারই শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছ। জীবের সহিত শ্রীভগবানের এই যে মধুর সম্বন্ধ ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম, এই ধর্ম্ম-সাধনাই ভক্তের সাধনা-কার্য্য।

তুলসী।

ভক্তি মানুষ-হৃদয়ের কুসুম-কোমলা বৃত্তি। কুসুম-কোমলা বলি কেন? কুসুম যেমন সুগন্ধ, কুসুম যেমন কোমল, এবং সর্ব্বোপরি কোমল কুসুম যেমন দেবপূজার উপযোগি,—ভক্তিও তদ্রূপ। ভক্তি কোমলভাবে ভগবানের চরণে লাগিয়া থাকিতে চায়—শ্রীভগবানের চরণ ছাড়া ভক্তির আর স্থান নাই—ভক্তির

আর অন্যত্র গতি নাই। কুসুম যেমন সরল সুন্দর মধুর ও সরস-ভাবে জগতের সুখ বর্দ্ধন করে—অন্তর্জগতে ভক্তির আবির্ভাব, তাহা অপেক্ষাও সুন্দর, তাহাও অপেক্ষাও সরস, তাহা অপেক্ষাও মধুময়। চর্ম্মচক্ষুতে আমরা কুসুম-বিকাশ—কুসুম-সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু ভক্তিসন্দর্শন দিব্যনয়নাপেক্ষ। শ্রীগুরুর কৃপায় যাঁহার সে চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তিনিই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হয়েন, সে রস-সৌন্দর্য্যে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া সতত বিভোর থাকে।

সুকোমল ব্রজগোপালের উপাসনায় আমরা দ্বিবিধ কুসুমের ব্যবহার করি,—এক বহির্জগতের কুসুমকাননের কুসুম—অপর আমাদের অন্তর্জগতের ভক্তিকুসুম। বহির্জগতের কুসুম বহিরঙ্গ—শ্রীভগবৎ পূজার এক উপচার। ঋষিবাক্যবিহিত বাহ্য পূজায় ইহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু অন্তর্জগতের উপাসনায় আমাদের হৃদয়কাননের সুগন্ধি ভক্তি-কুসুম ব্যতীত আমরা আমাদের চিত্তরঞ্জন আনন্দ-গোপালের শ্রীপাদপদ্মে আর কোনও কুসুম পূজার উপহাররূপে লইয়া উপস্থিত হইতে পারি না।

ভক্তিকে কেহ কেহ ক্রিয়া বলেন, কেহ বা ধ্যান বলেন, কেহ বা ভাবনা বলেন, কেহ বা রস-বিশেষের স্ফুরণ বলেন—এ সকলই সত্য বলা যাইতে পারে—কিন্তু আমার মনে হয় ভক্তি একটি বস্তু—একটি দ্রব্য। যাঁহারা শক্তিকে দ্রব্য পদার্থ বলেন না, তাঁহারা আমার কথার পোষকতা না করিতে পারেন—আমি

ভক্তিকে শক্তি দ্রব্য বলিয়াই ইহাকে শক্তি আখ্যায় অভিহিত করি। কিন্তু এই ভক্তি জড়ীয় শক্তি নহেন,—জড়ে যে ইহার আবির্ভাব হয় না—একথা বলিতে পারি না। জড়ে ইহার আবির্ভাব আমার স্বীকার্য্য। তুলসী বৃক্ষটী জড় কিন্তু এই জড় বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—সাক্ষাৎ ভক্তি। এই ভক্তি,—বৃন্দা, বৃন্দাবনী, শ্রীকৃষ্ণজীবনী—নন্দিনী ইত্যাদি কত নামেই নানা-পুরাণে অভিহিত হইয়াছেন। এই ভক্তি সাক্ষাৎ শ্রীভগবানেরই আনন্দময়ী শক্তি—তুলসী তরু জড়রূপ হইলেও ইহার ভিতরে আমি এক মহালক্ষ্মী মহাশক্তির স্ফুরণ দেখিতে পাই।

তুলসীরাণীকে দেখিলেই আমার ভক্তিমূর্ত্তি মনে হয়—সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সারল্য-প্রীতি-পবিত্রতার যদি বাহ্যমূর্ত্তি দেখিতে কাহারও বাসনা হয় তবে আমার নিবেদন এই যে দর্শনেচ্ছু একবার আপনার আলয়স্থ সর্ব্বতীর্থস্বরূপিণী সর্ব্বদেব-সমাগমময়ী—ঐ তুলসী তলায় একবার উপবেশন করুন—আর ঐ চির শ্যামল স্নিগ্ধমাধুর্য্য-ময় হরিত পত্রাবলীসমাবৃত শ্রীশ্রীবৃন্দাবনী মহারাণীর প্রতি ভক্তি নয়নে দৃষ্টিপাত করুন—দেখিবেন উহার অঙ্গে অঙ্গে পত্রে পত্রে যেন মধুরোজ্জল পবিত্র ঝলক ফুটিয়া উঠিতেছে—সে পবিত্র মাধুরী -রসময় স্ফুরণে আপনার হৃদয়ের স্তরে স্তরে ভক্তিশক্তির সুধাধারা সিঞ্চিত হইয়া আপনাকে শ্রীভগবানের স্বীয় ধামের রস-সুধাস্বাদনে অধিকারী করিয়া তুলিতেছে!

ভক্তি-সন্দর্শনের এই প্রথম উপায়—ইহাই সহজ পথ! পাঠক—তুলসী তলায় আশ্রয় করুন। শাস্ত্রে ভক্তি ও ভক্তের

অনেক কথা আছে কিন্তু তাহাতে সহজে অনুভব হয় না। আমরা বাহ্যজগতে কুসুমোদ্যানের দিকে দৃষ্টি করিয়া ভক্তির ভাব হৃদয়ে আনিতে পারি কিন্তু তুলসী রাণীর অপর নাম—কুসুম-সার।

সমগ্র কুসুম রাজ্যে যে ভক্তি স্ফুরণ,—একমাত্র তুলসীতে সে সকল অপেক্ষা ও অধিকতর স্ফুরণ অনুভব করিয়া সাধক ভক্তি-রসের আস্বাদন কৃতার্থ হইতে পারেন।

ঋষি বাক্যের তুল্য বাক্য নাই, ঋষি-বাক্য তুল্য প্রমাণ নাই। এসম্বন্ধে মহর্ষিগণ অতি সারকথা বলিয়া রাখিয়াছেন :—

দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা।
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা॥

মৎকৃত শ্রীরায় রামানন্দ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—"হিন্দু, আপনি শাকসবজীর উদ্যান করিতে ভালবাসেন, তাহা করুন; ফলপ্রদ বৃক্ষের বাগান করা প্রয়োজনীয়, তাহাও করুন,—দর্শন-শোভার জন্যই হউক অথবা শ্রীশ্রীভগবানের সেবনের জন্যই হউক আপনি বাড়ীতে কুসুম-কানন করুন, কিন্তু আমার সর্ব্বোপরি নিবেদন এই যে বাড়ীর কোন সুন্দর পবিত্র স্থানে আপনি অবশ্য তুলসীর উদ্যান করুন—স্নানান্তে তুলসী দেবীকে জলসিক্তা করিবেন এবং ভক্তিভরে প্রণাম করিবেন, সন্ধ্যাসমাগমে তুলসী তলায় তৈলের একটি প্রদীপ দিবেন, তুলসীতলায় একবার প্রণত হইবেন, এবং তুলসী দেবীর পবিত্রমনোহরা প্রীতি-মধুরা-ভক্তি-প্রেমভরা স্নিগ্ধপ্রসন্ন শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিবেন—দেখিবেন হৃদয়ে পবিত্রতার সঞ্চার হইয়াছে, পার্থিব কুচিন্তা হইতে চিত্ত শান্তি, ও প্রসন্নতা লাভ করার পথ পাইয়াছে, এবং হৃদয়ে প্রেম ভক্তির উদয় হইয়াছে।" ভক্তি লাভের এই এক সাধন! ইহা সাধক-মহোদয়গণের সুপরীক্ষিত মহাসত্য।

ইতি।